মৃগতৃষ্ণা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

এই লেখকের

পঙ্কজা

মাথুর

মধুমতী

রাতভোর

রাগিণী

মৌনবসন্ত

রঙ্গরাগ

চন্দনডাঙার হাট

বেগম

ঘুমটা ভেঙে গেল আচমকা কাছাকাছি একটা যান্ত্রিক আওয়াজে। কোনোমতে উঠে বসলেন চন্দ্রবদন চাটুজ্যে। কম্বলটা পায়ের ওপর তুলে দিলেন বিশীর্ণ হাতে। কোটরাগত ছোট ছোট দুটি চোখ একটু চিকচিক করে উঠল।

তাকালেন সামনের আধখানা খোলা জানলাটার দিকে।

দপদপ করে দুটো আলো জ্বলছে আকাশে। একখানা উড়ন্ত বিমান চলে গেল খুব নীচু দিয়ে।

চাটুজ্যের অতি শীর্ণ দেহখানা কাঠের মতো খটখট করে নড়ে উঠল। বুকের ভেতর থেকে উঠল কাঁপুনি। পাঁজরাগুলো বুঝি বা ভেঙে যায়।

আর সেই দমকে দমকে কাশি।

কাশতে কাশতে নাকের পাতা দুটো ফুলে গেল। খুদে চোখ দুটো দুটি রক্তিম কামরাঙার মতো যেন ঠেলে বেরোতে চাইছে। প্রাণ যায়!

বুকের ওপর প্রাণপণ শক্তিতে হাতখানা চেপে কাশির বেগ কমাবার চেষ্টা করছেন। অনেক চেষ্টায় কিছু কাশি উঠল থুতুর সঙ্গে। ঠাণ্ডা বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে অন্ধকারে পাশ থেকে বার্লির একটা খালি কৌটো মুখের কাছে আনলেন, তাতে থুতু ফেলে দুটো হাঁটুর ওপর মুখখানা চেপে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

কাশিটা যেন ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে কয়েকদিন, আর তেমনি জ্বর।

ঘন ভ্রূর ওপর কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল, বোধকরি নিজের ওপরই এক অব্যক্ত বিরক্তিতে।

তাকালেন সামনে।

আধখানা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের মস্ত বড় বাড়ির সামনে চারটে কংক্রিটের থাম। থামগুলো কী বিশাল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথাটা ঝিমঝিম করে চাটুজ্যের।

বালিশের তলায় হাতটা ঢোকান। কতকালের বালিশ। তুলো পুরনো হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। হাতড়ে হাতড়ে দেশলাইটা বার করেন—আর একটা ছোট মোমবাতি।

শিয়রের কাছে অধ্যাত্ম রামায়ণের মোটা মলাটের ওপর মোম-বাতিটি জ্বালিয়ে বসিয়ে দেন। আস্তে আস্তে ডান দিকের তাক থেকে নামিয়ে আনেন ছোট একটি চৌকো টিনের বাক্স।

এক ফোঁটা 'ফেরাম ফস্' খেতে হবে।

চুপ করে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। ভাবতে থাকেন।

এর আগেও তো জ্বরের ভেতর কয়েক ফোঁটা খাওয়া হল। কই কিছুই তো হচ্ছে না।

থাক। 'আর্স আয়োডাইড' খেয়ে দেখা যাক।

ওষুধের ছোট্ট শিশিটা হাতে নিয়ে হাঁটুর দুটি হাড়ের চাকির ওপর চিবুকটা রেখে চুপ করে বসে থাকেন আরও কিছুক্ষণ। আজ প্রায় ন দিন হয়ে গেল। কিছুতেই কমছে না। জ্বরের তাপ আর জ্বালা নীরবে সহ্য করেন, কিন্তু কাশির বেগটা যেন সওয়া যায় না। এত কষ্ট! কীই বা করা যাবে।

কালো আকাশটার দিকে তাকান চন্দ্র চাটুজ্যে।

ছোট ছোট তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলেন।

কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কী অপরূপ প্রকাশ। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আশ্চর্যভাবে ভুলে যেতে পারেন তিনি নিজের অনেক বেদনা। আকাশ ওঁর বড় প্রিয়।

অধ্যাত্ম রামায়ণের মলাটের ওপর মোমবাতি পুড়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

আবার সমস্ত স্নায়ুগুলো কেঁপে ওঠে যেন। ভয়ে চমকে ওঠেন। বুকের ওপর একটা হাত তোলেন ধীরে ধীরে। বোতামটা খুলতে গিয়ে খানিকটা ছিঁড়ে যায় জামাটা। পচে গেছে। বুকের ওপর হাতখানি চাপতে চেষ্টা করেন। হাতেই বা আর কত জোর! গায়ের তাপে ঠাণ্ডা হাতের পাতা দুটি একটু গরম হয় মাত্র। কিন্তু কিছুতেই রোখা গেল না। আবার সেই ভয়াবহ কাশির বেগ। গলাটা বুঝি বা ছিঁড়ে গেল। কাশির বেগে বুক ভেঙে গেল বোধহয়। দম নিতে পারেন না। হাঁফ ধরে যায়। দুহাতে চৌকির দুটো ধার চেপে ধরে কাশতে থাকেন।

আবার কিছুটা ওঠে। বার্লির কৌটোটার ভেতর থুতু ফেলতে গিয়ে কাঁপতে থাকেন। অবশ হয়ে আসছে সর্বশরীর। তবু শুতে ভয় হয়। শুলে যদি আবার কাশির বেগ আসে।

চুপ করে বসে থাকতে হয়। ভয়ে আতঙ্কে কাঠ হয়ে বসে থাকেন। মাথাটা আর তোলা যায় না। হাঁটুর ভেতরে নুয়ে পড়ে।

চুপ করে বসে থাকেন।

মোমবাতিটা এতক্ষণে নিঃশেষ হয়ে গেল।

অন্ধকারটা পাতলা হয়ে এসেছে। সামনের বিরাট থামগুলো একটু যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তবে কি ভোর হয়ে এল?

ছোট ছোট চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করেন।

না। আকাশে অনেক তারা। নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি এখনও।

আর ভোর হলেই বা কী!

এই ছোট্ট ঘরটুকুতেই শুয়ে পড়ে থাকতে হবে। ঝি এসে একটু হয়তো চা দিয়ে যাবে। হয়তো একটু বার্লি পাঠাবে বেলা হলে। কেউ আসবে না। আসবে শুধু একজন।

হ্যাঁ। ও ঠিকই আসবে।

চোখ দুটো বুজে আসে চন্দ্রবদন চাটুজ্যের। ঘুম নয়। ভাবনার বিরাম নেই।

কত কাল তো কেটে গেল এই ছোট ঘরখানিতে। এরা তার কেই বা হয়। আপনার কেউ নয়। অজয়কে পড়াতেন। অজয় বড় হল। নিজেদের ব্যবসায় বেরোল। বিয়ে করল। চন্দ্রবদন চাটুজ্যে রয়েই গেলেন এ সংসারে। অজয়ের মা যেতে বললেন না। চাটুজ্যেও কখনও বললেন না, আমি যাব।

আর যাবেনই বা কোথায়? কেউই তো ওঁর নেই শোনা যায়।

তবু কেন যে তিনি প্রতি শনিবার দুপুরে বেরোন, ফেরেন রবিবার সকালে কি কখনও বিকেলে, এটা কেউ জানে না।

আর জানবার দরকারই বা কী? বাইরের ওই ছোট্ট ঘরখানায় আছেন, থাকুন।

থাকলে উপকার যে একেবারে হয় না তা নয়। দোকানটা, বাজারটা। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ-বিষুধ মাঝে-সাঝে দিয়ে থাকেন। তা কাজ মন্দ হয় না। জ্বর-জ্বারি হলে দু-একদিনেই সেরে যায়। একটু পেট খারাপ কি সর্দি। বেশ কাজ দেয় ওঁর ওষুধে।

দুটো মাঝারি টিনের বাক্স ভর্তি ওষুধের শিশি। চন্দ্রবদন চাটুজ্যের সম্পত্তি বলতে ওই।

একবার মাঝরাতে অজয়ের যায়-যায় অবস্থা। ভেদবমি।

অজয়ের মা পারতপক্ষে চাটুজ্যের সামনে বেরোন না। সেদিন বেরোলেন। বললেন—আপনি যদি একটু ডাক্তারখানায় যান চাটুজ্যে-মশাই।

চাটুজ্যে হাসলেন। শুনলেন কী হয়েছে। তারপর ওই টিনের বাক্স থেকে বার করলেন ছোট শিশি। সাদা গুঁড়োয় দু ফোঁটা দিয়ে বললেন—খাইয়ে দিন।

—কিন্তু। যায়-যায় অবস্থা। এখন কি আর চাটুজ্যে মশাইয়ের হোমিওপ্যাথিতে মন মানে!

—কিছু ভয় নেই।—আবার চাটুজ্যের গালভাঙা মুখের হাসি।

অগত্যা খাওয়ানো হল। আর আশ্চর্য যে ওঁর ওষুধেই সেবার ভালো হয়ে গেল অজয়।

রাতবিরেতে বিপদে আপদে তো আছেনই। তা ছাড়া অজয়ের ছেলেটি সঞ্জয় যখন বড় হয়ে উঠল, তাকে পড়াবার ভার নিলেন চাটুজ্যে। সঞ্জয় আর কেউ বলে না, সবাই ডাকে রাস্থ।

এতটুকু বয়স থেকে রাস্থ চাটুজ্যের ভারী বাধ্য। কারো কাছে যখন থাকে না, অজয়ের স্ত্রী তখন বাইরের ছোট ঘরখানার সামনে এনে ছেড়ে দেয় রাস্থকে। রাস্থ থপথপ করে এসে চড়ে বসে চাটুজ্যের পিঠে। ন্যাড়া মাথার ওপর ছোট ছোট হাত বোলাতে বোলাতে খিলখিল করে হাসতে থাকে।

চন্দ্রবদন চাটুজ্যের কোটরের ভেতর ছোট ছোট চোখ দুটি এই সময়টাই মাত্র চিকচিক করে ওঠে আনন্দে। ওঁর শীর্ণ হাতের শিরার ওপর হাত বোলায় রাস্থ।

চাটুজ্যে নীরবে একটু হাসেন। ওষুধের সাদা গুঁড়ো সুগার অফ মিল্ক একটু কাঠির মতো আঙুলে তুলে ওর মুখে দেন।

রাস্থ চাটতে চাটতে খুব খুশী।

ওর মা কখনও দেখে বলে, মাস্টারবাবুর ওই গুঁড়ো যে ওর কী মিষ্টি লাগে। সন্দেশ ফেলে ওখানে চলে যাবে গা!

—তা যাক।—অজয়ের মা বলেন।

বউ বলে, আমার বাপু বড় ঘেন্না করে। সাতজন্মে চান করেন না মাস্টারবাবু। কী নোংরা! ওঁর কোল থেকে এলেই রাস্থর গায়ে কেমন গন্ধ গন্ধ লাগে।

হাসতে থাকেন অজয়ের মা।

কথাটা সত্যি। চাটুজ্যে বছরে মাত্র চারদিন কি পাঁচদিন স্নান করেন। তাও গরম জলে রোদে দাঁড়িয়ে। কারণ জিজ্ঞেস করলে প্রথম দু-একবার উত্তর দেন না। তৃতীয়বার হয়তো বলেন—সয় না।

হোক নোংরা। তবু রাস্থ যাবেই।

অজয় বলে, যাক না। উনি একটু ধরলে তোমারও তো কাজকম্ম করবার সুবিধে হয়।

তা বটে। পোয়াতির ছেলে-ধরুনী হওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

চাটুজ্যে কিন্তু নির্বিকার। দিনের ভেতর অনেক সময়ই রাস্থকে কোলে রাখতেন, নয়তো রাস্থ ওঁর মাথার টাক পিঠের হাড়ে টিপে ডলে চাঁটি মেরে খেলে চলত, উনি চুপ করে বসে থাকতেন। তা করবে নাই বা কেন। সংসারে বাড়তি মানুষ থাকলে বাড়তি কাজও করে থাকে।

—এমন একটা বেশী কিছু করছেন না। বলতে চায় অজয়ের স্ত্রী।

রাস্থ একটু বড়সড় হয়ে উঠল। ছ বছরের ছেলে। প্রথম ভাগ শেষ

হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ভাগও। চাটুজ্যেই পড়ান। বাপকেও পড়িয়েছিলেন। ছেলেকেও।

রাম্ভু কিন্তু পড়তে চায় না।

—তোমার জামাটা একদম ছিঁড়ে গেছে দাদু।

বলে চাটুজ্যের কাঁধের কাছে ছেঁড়া জামাটা ধরে টানে। আরও ছিঁড়ে যায়।—বড় দুষ্টুমি কর। পড়ো এখন।

রাম্ভু বইটার পাতা উলটে বলে—বাবার কাছে একটা জামা চেয়ে নাও না কেন?

—এখন পড়ো।

—আগে বলো।

—আঃ!

—আচ্ছা আমি আজ চেয়ে দোব।

—পড়বার সময় বাজে কথা বলতে নেই।

—দাদু, কাল তো শনিবার। মা বলছিল।

চাটুজ্যে নীরবে ওর দিকে তাকান।

—কথা বলছ না কেন?

—কী বলব?

—কাল তুমি বেড়াতে যাবে তো?

—হুঁ।

—আমায় নিয়ে যাবে?

চাটুজ্যের চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে আসে।

রাম্ভু ওকে ধরে ঝাঁকায়,—বলো নিয়ে যাবে আমাকে?

চাটুজ্যে বলেন, বলছি, এখন পড়ো।

—আগে বলো, কোথায় যাবে কাল?

শনিবার সত্যিই চন্দ্রবদন চাটুজ্যে বেরোন। ওই একটি দিনই বেরোন। ফেরেন পরদিন।

কোথায় যান কেউ বিশেষ ভালো করে জিজ্ঞেস করে নি কখনও। চাটুজ্যেও বলেন নি। সবাই জানে, কোনো বন্ধুর বাড়ি যান, নয়তো কোনো আত্মীয়ের বাড়ি। এমনিতেই চাটুজ্যে বেশি কথা বলেন না। অল্প কথায় চাটুজ্যেও ওই রকম একটা কিছুরই আভাস দিয়েছেন আজ পর্যন্ত।

রাস্থর কথায় একটু মুশকিলে পড়েন চাটুজ্যে।

বলেন, এখন তাহলে পড়বে না?

রাস্থ চটে যায়,—না বললে তো বয়ে গেল। আড়ি করে দেব।

চাটুজ্যে কথা বলেন না।

রাস্থ রেগে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

চাটুজ্যে যেমন বসে ছিলেন চৌকির ওপর তেমনই বসে থাকেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে।

চাটুজ্যে সামনের জানলার দিকেই তাকিয়ে থাকেন।

সামনের রাস্তায় মাঝে মাঝে দু-একটি রিকশার টুংটাং শব্দ।

মেটিরিয়া মেডিকাখানা খুলে সামনে রাখেন। চোখ বোলান, কিন্তু ঠিক পড়তে পারেন না। শনিবার তিনি কোথায় যান, কখনও বড় হয়ে যদি রাস্থ জানতে পারে! কী করেই বা জানবে? ততদিন এ পৃথিবীতে আর থাকবেন না চন্দ্রবদন চাটুজ্যে। মৃত্যুর দিনটার কথা ভাবতে চেষ্টা করেন। মন্দই বা কী? নিঃশেষ হয়ে ক্ষয়ে যাওয়া। নয়তো আবার নতুন কোনো রূপে সংসারে ফিরে আসা। ফিরে আসবার আর ইচ্ছে নেই। সংসারে কোনো আকর্ষণই নেই ওঁর। একটা মাত্র। না তাও নয়। রাস্থ? না। নিজের পাওনার দিকটা দেখে রাস্থকে ভালোবাসেন না তিনি।

তবু যদি—। ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে চাটুজ্যের। তাঁর জীবনে 'তবু' নেই, 'যদি' নেই। পিষে সোজা হয়ে গেছে সব।

—ও দাদু!

ওই আবার আসে রাস্থ।

গা ঘেঁষে বসে। পায়ের হাড়টা টিপে টিপে একবার মুখের দিকে তাকায়। চাটুজ্যের ভালো লাগছে না কথা বলতে। লক্ষ্য করে রাস্থ। দাদুর কি রাগ হল?

ওর ইজেরের পকেট থেকে একটা লজেঞ্জ বার করে।

—তোমার পায়ে একদম মাংস নেই দাদু।

আবার তাকায় চাটুজ্যের দিকে।

—একটা লবেঞ্চুস খাবে দাদু?

চাটুজ্যেকে এবার তাকাতেই হয়।

—তুমি খাও, বইটা নিয়ে যাও ভেতরে।

রাস্থ বইয়ের কাছে বসে—না, আমি পড়ব এখন।

—তবে পড়ো।

রাস্থ বইটা খুলে তার ওপর লজেঞ্জটা রাখে। দুটো কাঁচের গুলি পকেট থেকে বার করে। বইয়ের ওপর রাখে। চাটুজ্যে চুপ করে বসে থাকেন তেমনি। মাঝে মাঝে আপন মনেই বিড়বিড় করেন যেন। ঠোঁট দুটো একটু নড়ে।

রাস্থ তাকায়—কী বলছ?

—কই কিছু না তো।—চাটুজ্যের চমক ভাঙে।

এরপর আপন মনে রাস্থ হয়তো কিছুক্ষণ বই, কাঁচের গুলি, লজেন্স সব মিলিয়ে খেলে উঠে পড়ে।

চাটুজ্যে তাকান এবার। বলেন—শোন্। আমার জন্যে দুখানা

রুটি করতে বলিস তো তোর মাকে।

রাস্থ বেরিয়ে যায়।

একটু পরেই আবার ফিরে এসে বলে—মা বললে রুটি হবে না। ভাত খেতে হবে।

চাটুজ্যের চোখ দুটো আরও স্তিমিত হয়ে আসে।

—বললে, রোজ রোজ বুড়োর বায়নাক্কা!—মায়ের নকল করে হাত-পা নেড়ে বলে রাস্থ—অত বায়নাক্কা পরের সংসারে চলবে না!

দরজার পাশ থেকে রাস্থর মায়ের মুখ দেখা যায়।—অসভ্য ছেলে। আমি ওই কথা বলেছি? আমি বলেছি, ঘরে আটা নেই।

চাটুজ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন—তবে থাক মা। ভাতই খাব।

রাস্থর মায়ের গলাটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—দিন দিন ছেলের কী শিক্ষেই যে হচ্ছে। পড়াশুনো তো একেবারেই করে না। মিথ্যুক কোথাকার! আস্থক সে!

রাস্থ একবার উঁকি মেরে দেখে মা চলে গেছে কিনা। তারপর চাটুজ্যের মুখের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলে—জান দাত্থ, মা মিছে কথা বলে গেল। সত্যি বায়নাক্কা বলেছে।

চন্দ্রবদন চাটুজ্যে রাস্থর মাথায় একটা হাত রাখেন, আস্তে আস্তে বলেন—মায়ের নামে অমন কথা বলতে নেই। যাও, বই নিয়ে ভেতরে

বইটা তুলে নিয়ে রাস্থ আস্তে আস্তে বলে—তোমার মা নেই?

চাটুজ্যে মুখটা তোলেন।

—ছিল।

—তোমার মা তোমাকে বকত?

—না।

—খেললে বকত না?

—আমি তো খেলতুম না।

চাটুজ্যে ষাট বছর আগে এক গাঁয়ের টিনের ঘরে ফিরে গেছেন। চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠছে কৃষ্ণকালো মুখখানা আর ভাসা-ভাসা দুটি চোখ। তখন ওই চোখ দুটি দেখতে ভালোবাসতেন চাটুজ্যে আর আজও আকাশে সেই চোখের মায়া বুঝি খুঁজে পান চাটুজ্যে। আকাশের চেয়েও সীমাহীন দুটো চোখের কথা আজও সুস্পষ্ট মনে আছে। অমন চোখ বোধহয় শুধু মায়েরই হয়।

—তুমি খেলতে না!—রাস্থর কাছে এটা এক পরমাশ্চর্য বার্তা।

—না। খুব অসুখে ভুগতুম কিনা!

চন্দ্রবদন আশৈশব রুগ্ন। মার কথাগুলো মনে আছে। বলতেন, এটা বাঁচবে না, মিছিমিছি জ্বালাতে এসেছে আমায়।

চন্দ্রবদন চিরদিন শুধু ভুগলেনই। মরলেন না।

—ধ্যুস্! তুমি যে কী ইয়ে! রাস্থ পালাল।

চন্দ্রবদন আকাশের দিকেই তাকালেন আবার। ঘুরেফিরে সেই গাঁয়ের কথাই আনাগোনা করে মনে।

চৌষট্টি বছরের কত কথা। কত মানুষের মুখ। এক সীমা থেকে শেষ সীমায় যেতে যেতে পথে কত আলাপ, কত পরিচয়!

অধ্যাত্ম রামায়ণের চিহ্ন-দেয়া পাতা খোলেন চাটুজ্যে।

দুই

জীবনে বড় আশা কিছু ছিল না, তাই ক্ষোভও ছিল না। এমনি করেই যদি আরও কয়েকটা বছর কেটে যেত, তবে হয়তো জীবনে কোনো অভিযোগ থাকত না। কিন্তু কাটল না।

পুজোর আগেই জ্বরে পড়লেন চন্দ্রবদন।

জ্বরটা খুবই বেশি। চুপ করে পড়ে থাকা ছাড়া আর কী করতে পারেন। মাঝে মাঝে রাসুর মা এসে দিয়ে যায় গরম জল আর বার্লি। রাসুকে বলে—ডেকে দে।

রাসু এসে ধাক্কা দিল—দাদু।

চোখ মেললেন অতি কষ্টে। চোখ দুটো রাঙা।

—দাদু খেয়ে নাও।

কথা বলবার মতো ক্ষমতা নেই। তেমনি পড়ে রইলেন চাটুজ্যে। রাসু মাথাটায় একটু হাত বোলাল—ওরে বাস, কী গরম!—বললে আপন মনেই।

ওষুধের বাক্সটা নামাল টেনে।—দাদু, ওষুধ দোব?

হাতে যেটা উঠল সেই শিশি থেকেই বিজ্ঞের মতো ছোট কাঁচের গ্লাসে ওষুধ ঢালল। অনেকগুলো ফোঁটা পড়ে গেল।—ওষুধটা খেও।

বলে আপন মনেই চলে গেল রাসু।

চাটুজ্যে পড়ে রইলেন তেমনি। দিন কেটে গেল। রাত্রে অজয় এসে সব শুনে একবার দেখতে গেল।

গায়ে হাত দিয়ে দেখল জ্বরটা কিছু বেশি।

—থাক। ঘুমোক।

অজয় চলে গেল। রাতটাও কাটত বেঘোরে। কিন্তু কাটল না। সন্ধ্যের পর থেকে কাশির বেগে অস্থির হয়ে উঠলেন চাটুজ্যে।

চোখ দুটো মেললেন। ঘোলাটে চোখে কিছু দেখাও যায় না। হাতড়ে বার করলেন মোমবাতিটা। জ্বাললেন। একটু ভাববার চেষ্টা করলেন।

হঁ্যা। 'ফেরাম ফস্'। টিনের কৌটো থেকে 'ফেরাম ফস্'-এর শিশিটা বার করতে অনেক সময় লেগে গেল। আবার একটু ভাবলেন। 'অ্যাকোনাইট টু-হানড্রেড' এক ফোঁটা প্রথমে খেলে ভালো হত। আবার খুঁজে বার করতে হল।

চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুনের মত তাপ বেরোচ্ছে। মাথাটা কেমন করছে। কাশতে কাশতে উপুড় হয়ে পড়লেন চাটুজ্যে।

ওষুধ দুটো রইল হাতে। চুপ করে পড়ে রইলেন। সমস্ত রাত।

ভোরে ঘোরটা কেটে গেল। চোখটা মেলবার চেষ্টা করলেন চাটুজ্যে। একটু যেন ভালো লাগছে। ভোরের বাতাসটা বেশ আরাম দিচ্ছে।

জামাটা ঘামে ভিজে গেছে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাসে একটু শীত-শীত করছে যেন।

বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করলেন চাটুজ্যে। জ্বরটা বোধহয় একটু কমেছে। কপালটা ঘামছে বার বার। বালিশটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। স্যাঁতসেতে।

উলটে নিলেন বালিশটা। জামাটা খুললেন। কী পরবেন আর। কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে এপাশ ওপাশ তাকালেন। একটু

জল পেলে বড় ভালো হত। কী তৃষ্ণা! একটুখানি জল। কোথায়? এক ফোঁটা জলও নেই।

সন্ধ্যেবেলা দুপুরের বার্লি-জল ফেলা গেছে দেখে রাস্থর মা আর জল রেখে যায় নি।

শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চাটলেন চাটুজ্যে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। আবার একটু ঘুম-ঘুম।

একটা ছোট্ট ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল আবার।

—দাদু। ওঠো।

তাকালেন চাটুজ্যে। বলতে চেষ্টা করলেন কিছু। কেশে কেশে গলাটা একেবারে ভেঙে গেছে।

পাশ ফিরে বাটিটা রাস্থর হাতে দিয়ে বললেন—জল।

রাস্থ বুঝতে পেরে ছুটে ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই এক বাটি জল নিয়ে এল, বোধহয় কল থেকে। পায়ে হাত দিয়ে ঠেলল—দাদু। উঃ, তোমার পা কী ভিজে আর ঠাণ্ডা।

চাটুজ্যে উঠে জলটা খেয়ে নিলেন।

—কাল ওষুধটা খেয়েছিলে? ওই যে দিয়ে গেলুম?

চাটুজ্যে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন আবার।

—থাক। ঘুমোও।

আবার ঠিক বাবার মতো মুখটা গম্ভীর করে বলে—অসুখে ঘুমটা দরকার।

ওর বলবার ভঙ্গীতে হাসি পায় চাটুজ্যের। শুয়ে পড়েন।

রাস্থ চলে যায়। তেমনিই পড়ে থাকেন চাটুজ্যে।

আবার একটু পরেই রাস্থ ছুটে এসে হাজির।

—এই নাও।—ঠেলা মারে চাটুজ্যেকে। প্যাণ্টের পকেট থেকে দুখানা বিস্কুট বার করে চাটুজ্যের হাতে দেয়।

চাটুজ্যে বিস্কুট দুটো নিয়ে নিলেন। খিদে বোধ হচ্ছিল খুব।

চাটুজ্যে জানেন যে ওটা রাম্বুর জলখাবারের পয়সা থেকে কেনা। তবু নিলেন। ওকে বললেন না, তুমি খাও। রাম্বু কিন্তু ভারী খুশী।

—তুমি খাও। আমি চা আনছি। মা চা করছে এখন।

রাম্বু ছুটে বেরিয়ে যায় আবার।

চাটুজ্যে বিস্কুট দুটো একটু একটু করে খেতে থাকেন।

চা আসে। বার্লি আসে। এমনি করে প্রায় ন দিন কেটে গেল।

জ্বর কমেছে। কাশি আর কমে না। দিন দিন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছেন। আর তেমনি দুর্বল। উঠতে গেলে শরীরের হাড় কখানা ঠকঠক করে কাঁপে। তবু উঠতে হয়। বসতে হয়। খেতে হয়। বিছানাটা পেতে নিতে হয়।

নিজেই ঠিক বোঝেন না কী হল। আজ 'আর্স আয়োডাইড' খাবেন ঠিক করেছেন। কাশিটাকে জব্দ করতেই হবে। বার বার ওষুধ খাচ্ছেন। 'মেটিরিয়া মেডিকা' ঘেঁটে ঘেঁটে ওষুধের পর ওষুধ।

হেরে যাচ্ছেন তিনি। হেরে হেরে আরও যেন হতাশ হয়ে পড়েছেন।

অজয় আপিস বেরোবার আগে একবার উঁকি মারে—আজ কেমন আছেন মাস্টারমশাই?

তাকান চাটুজ্যে—খুব ভালো নয়।

—কী হল বলুন তো?

—কাশিটা একটু বসে গেছে।

—ওষুধ খাচ্ছেন তো?

ঘাড় নাড়েন চাটুজ্যে। অজয় আর কথা বলে না। আপিসে বেরিয়ে যায়। অজয়ের মা আসেন একটু পরে।—কাল রাতে তো বড্ড কাতরাচ্ছিলেন ?

—হুঁ।

—আজ কেমন আছেন ?

হাত বেঁকিয়ে জানান চাটুজ্যে—একই রকম।

চলে যান অজয়ের মা।

ইস্কুল যাবার মুখে রাস্থ ঘরে ঢোকে।

—ও দাদু !

হাতে মাথাটা রেখে ঝিমোচ্ছিলেন চাটুজ্যে। তাকাতে ইচ্ছে হয় না। কোনো কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। চুপ করেই পড়ে থাকেন।

রাস্থ কাছে আসে। চাটুজ্যের দিকে তাকায়। কী জানি কেন ভারী বিরক্ত লাগে ওর।

—ধুত্তোর !

হাত দিয়ে ঠেলে চাটুজ্যের মাথাটা উঠিয়ে দেয়।

—ওঠো। এত ঘুমোলে ভালো লাগে না।

চাটুজ্যের হাসি পায়। হাসতে কিন্তু পারেন না।

—আর ঘুমোলে কিন্তু আড়ি করে দোব।

বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় রাস্থ।

চাটুয্যের স্নায়ুগুলো যেন একটু সতেজ হয়ে ওঠে। রাস্থ ওকে জোর করেই সতেজ করতে চায়।

কিছুটা পারেও। ওর প্রাণের উত্তাপের ছোঁয়াটা বেশ অনুভব করতে পারেন তিনি। তবু কতক্ষণই বা ! রাস্থ তো স্কুলে গেল। সমস্ত দিনটা একভাবে পড়ে থাকা।

দুপুরে খাবার হয়তো পাঠাবে রাস্থর মা। অথবা নিজেই দিয়ে যাবে। কিন্তু খেতে একেবারে ইচ্ছে হয় না। যেন বিস্বাদ লাগে। কিছু খেতে ইচ্ছে হয় না।

—বার্লির সঙ্গে একটু তরকারি দোব ?—হয়তো কোনদিন জিজ্ঞেস করে রাস্থর মা।

চাটুজ্যে হ্যাঁ-না কী বলেন বোঝা না গেলেও নিয়ে আসে।

আনলে কী হবে। মুখে ভালো লাগে না। সবটা তরকারিই পড়ে থাকে। এঁটোটা নেবার সময় রাস্থর মা একটু বিরক্ত হয়, তরকারিটা নষ্ট হল বলে। তবু মুখে বলে—কী হল আপনার ? কিছুই যে খেতে পারেন না ?

তরকারিটা ফেলা যাওয়াতে চাটুজ্যেও একটু লজ্জিত হন।

বলেন, কেমন বমি-বমি আসে।

রাস্থর মা মুখটা ব্যাজার করে বাটি নিয়ে যায়।

অজয় আপিস থেকে এসে দিনের খবর সব স্ত্রীর কাছ থেকে পেয়ে থাকে।

আজও সব খবর পাবার সময় ও খবরটাও পায়।

অজয়ের মা বলে—বুড়োর যে কী হল বাপু! এবার বোধ হয় বাঁচবে না।

অজয় শুনে হেসে বলে—না না, মানে একটু কড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা মা। ফ্লু।

—না বাপু। কিছু মুখে তুলতে পারে না।

—ও অমন অরুচি হয়। ওতে ভয় নেই। তা ছাড়া—অজয় একটু গম্ভীর হয়ে ভেবে বলে—মরলেও বা কী করতে পারি।

রাস্থর মা বলে—ওঁর কে আছে, তাকে খবর দাও।

অজয় চিন্তিত মুখে বলে—শুনি তো কেউ নেই।

—তা কখনও হতে পারে! জ্যাঠা-খুড়ো-পিসে কেউ নেই?

—বলেন তো নেই কেউ। বিধবার এক ছেলে ছিলেন। মা মারা গেছেন, আর কেউ নেই।

রাসুর মা খুব বিরক্ত হয়—ভালো লোক জুটিয়েছিলে। এখন ঠ্যালা সামলাবে কে? তবে—না হয় ডাক্তার দেখাও।

—কেন, ওষুধ তো খাচ্ছেন।

রাসুর মা এবার চটে বলে—ধুস্! ওই তোমার ফোঁটা ওষুধে কিছু হবে না।

অজয় এবার বিজ্ঞের মতো হেসে বলে—কী যে বলো! ওই ফোঁটা ওষুধের কী শক্তি জান?

—শক্তি জানবার আমার দরকার নেই। তুমি জানো গে! মোদ্দা আমি ভালো বুঝছি না।

অজয় বলে—আচ্ছা দেখা যাক। আর দু-চার দিন।

—কী আর দেখবে! ও বুড়ো বাঁচবে না।

রাসু ঘরে ঢোকে এর ভেতর,—কে বাঁচবে না মা?

রাসুর মা রাসুর কানটা ধরে একটা চড় বসিয়ে দেয়—যেই হোক, সব কথায় তোর থাকবার কী দরকার শুনি?

অজয় বোঝে কার ওপর রাগ কার ওপর পড়ল।

কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। জামাটা পরে বেরোয় ক্লাবে তাস খেলতে। ফিরবে রাত দশটায়।

সেদিন রাত্রেও শুয়ে শুয়ে ওরা সবাই শোনে চাটুজ্যের কাশি। ঘরে বসে কাশছেন চাটুজ্যে। একটু ঘুমোতে পারেন না। শুলেই যেন কাশির বেগটা আরও বাড়ে। বুকটা এক হাতে ধরে অনবরত

কেশেই যাচ্ছেন। কাশতে কাশতে ঘাম জমে ওঠে কপালে, নাকের ডগায়। হাত পা কাঁপতে থাকে। দেহের স্নায়ুর জাল বুঝিবা ছিঁড়ে গেল।

ছিঁড়েই যাক। শিরাগুলোও ছিঁড়ে যাক। বন্ধ হয়ে যাক হৃৎপিণ্ডের কাজ।

আর পারেন না চাটুজ্যে। পেরে উঠছেন না কিছুতেই। বোঝবার ক্ষমতাও বোধহয় নিঃশেষ হয়ে আসছে ক্রমশ। দম নিতে না পেরে দুহাতে চৌকির দুধার ধরে কাঁপতে কাঁপতে কাশেন।

অনেকক্ষণ পর দু হাঁটুর ওপর মাথাটা রেখে ঝিমিয়ে পড়েন। শুতে সাহস হয় না। আবার যদি কাশির বেগটা ঠেলে ওঠে বুক থেকে!

আতঙ্কে বসে থাকতে হয় সমস্ত রাত। ঘুম নেই। বসে বসে একটু ঝিমোন মাত্র। রাতটা যে কী করে কাটে পরের দিন ভাবতে গেলে মাথা ঘোরে। আরও মাথা ঘোরে আবার রাত্রি আসবার আগে।

পরদিন সকালে উঠে অজয় চা খেয়ে একবার চাটুজ্যের ঘরের কাছে আসে। মুখটা ওরও খুব ব্যাজার। যেন মহা ভাবনায় পড়েছে।

—মাস্টারমশাই!

চাটুজ্যে বসে ছিলেন। চোখ দুটো তুলে তাকান। চোখ দুটো ঘোলাটে। স্তিমিত। অসহ্য বেদনার ছাপ চোখে—মুখেও।

—মাস্টারমশাই! একটা কথা বলছিলুম।

—কী?—কেশে কেশে গলার স্বর এত ভেঙে গেছে যে প্রায় বোঝা যায় না।

অজয় বলে—ভাবলুম আপনার অসুখ তো কমছে না। একটা ডাক্তার দেখালে—

—না। তেমন প্রয়োজন কিছু নেই।

মুখে বলেন চাটুজ্যে। ডাক্তার দেখাবার টাকাটা অজয়ের খরচ হবে, এটা ওঁর ভালো লাগে না।

অজয় তবু বলে—ডাক্তার দেখানোই আমার ভালো মনে হয়।

একবার ফ্যালফ্যাল করে তাকান চাটুজ্যে। চোখে গভীর হতাশা অজয়ের চোখ এড়ায় না। ও বলে—তবে ডাক্তার আনতে যাই।

চাটুজ্যে তবু বলেন—দু-একদিন যাক না।

—আপত্তি করছেন কেন বুঝতে পারছি না।

রাম্বর মা বোধহয় দরজার পাশ থেকে সব শুনছিল। চাটুজ্যের জন্ম বার্লির বাটিটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে বলে—কিসের আপত্তি?

—উনি ডাক্তার দেখাতে চান না।

—উনি চান না বললে তো হবে না। আমাদের একটা কর্তব্য অকর্তব্য আছে তো? একটা মানুষ এমন করে আজ দশ-এগারো দিন ভুগছে। কী চেহারা হয়েছে আপনার, যদি দেখতেন!

চাটুজ্যে ওদের মাঝখানে পড়ে একটু বিব্রত বোধ করেন।

অজয় বলে—তবে যাই। ডাক্তার নিয়ে আসি।

অজয় বেরিয়ে আসে। বার্লির বাটিটা রেখে রাম্বর মাও বেরিয়ে আসে।

চাটুজ্যে চুপ করে বসে থাকেন। মুখে যেন আর একবিন্দু রক্তও নেই। ফ্যাকাশে মুখের ওপর চামড়ার কুঞ্চিত রেখার ফাঁকে ফাঁকে ভিজে-ভিজে ঘাম। চোখ দুটোয় কোনো ভাষা নেই। এক অব্যক্ত যন্ত্রণার আভাস মাত্র।

বার্লি পড়ে থাকে। অনেকক্ষণ ওইভাবে কেটে যায়। এর ভেতরই একজন ডাক্তারকে নিয়ে ঘরে ঢোকে অজয়।

ডাক্তারবাবু এসে চৌকির একপাশে বসেন। অজয় দাঁড়িয়ে থাকে।

—কী ব্যাপার বলুন।

অজয় বলতে যায়। ডাক্তার বাধা দেন—উনিই বলুন। কী হয়েছে আপনার?

চাটুজ্যে ডাক্তারের দিকে একবার তাকিয়ে বলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ভাঙা গলায় একটা কথাও বেরোয় না। শুধু ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোয়।

ডাক্তার একটু সময় তাকিয়ে থাকেন।

অজয়ের কাছ থেকেই সব শোনেন অগত্যা।

—কিছুই খেতে পারেন না। আর কাশি জ্বর—মানে খুব কা।শ।

—থার্মোমিটার দিয়েছিলেন? জ্বর কখন কত হয়?

অজয় মাথা চুলকোয়—আজ্ঞে সেটা তো—ইয়ে আপনার—

এবার ডাক্তারবাবু পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বুক পিঠ দেখেন। পেট টিপে দেখেন। জিভও।

সব দেখেশুনে বলেন—আপনার কী খেতে ইচ্ছে হয়?

চাটুজ্যে জানান—কিছু না।

ডাক্তার বলেন—কিছু না বললে তো হবে না। সন্দেশ, রসগোল্লা, মাংস, ডিম, ভাত, রুটি—যা ইচ্ছে খেতে পারেন। খেতে হবে খুব। বলুন কী খাবেন?

চাটুজ্যে তাকিয়ে থাকেন শুধু।

ডাক্তার অজয়কে বলেন—চলুন আমার সঙ্গে।

অজয় বেরিয়ে যায়। চাটুজ্যে তেমনি বসে থাকেন।

রাসুর মা পাশ থেকে দাঁড়িয়ে সব শুনে বলে—তখনই বলেছিলুম

বাঁচবে না। মরবার আগে ডাক্তারবাবু তাই সব খেতে বলে গেল। আমি কি আর বুঝি না কিছু?

রাস্থ পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনল। মায়ের মুখের ওপর আর বলল না কিছু। মুখটা ওর শুকিয়ে গেছে। ভয় পেয়েছে রাস্থ। ভীষণ ভয় পেয়েছে। দাদু বাঁচবে না এই সোজা কথাটা তো কখনও ভাবে নি ও।

রাস্থর মা ভেতরে ঢোকবার আগেই অজয় বাড়ি ঢোকে।

রাস্থর মা বলে—ডাক্তার কী বললে?

অজয়ের মুখটা ভীষণ গম্ভীর। শুধু বললে—ভেতরে চলো।

ওরা কেউ লক্ষ্য করল না রাস্থও ওদের পেছনে পেছনে যাচ্ছে।

অজয় ভেতরের ঘরে গিয়ে বসে পড়ল।

অজয়ের মা তরকারি কুটছিলেন। বললেন—ডাক্তার কী বললে?

—সর্বনাশ হয়েছে।

অজয়ের চোখ মুখ দেখে সকলে রীতিমত ভয় পেয়েছে।

—কী হয়েছে বলো না।

অজয়ের গলা কাঁপছে—মাস্টারমশাই যে আমাদের সর্বনাশ করবেন স্বপ্নেও ভাবি নি।

—কী হল, বলো না।

অজয় মুখ তুলে বলে—কী আবার। যা হবার তাই। টি. বি. হয়েছে।

টি. বি.। মাত্র দু'টো কথা। দুটো ভয়াল আতঙ্কের মতো নাচতে শুরু করে সকলের সামনে।

—শুধু তাই নয়—অজয় বলে—ডাক্তারবাবু বললেন, স্টেথিস্কোপেই বোঝা যায়, এটা ওঁর আজ হয় নি। বছর তিনেকের পুরনো এতে সন্দেহ নেই।—অজয়ের গলা কাঁপে—এই তিন বছর ওঁর সঙ্গে বসে ভাত

খেয়েছি, কথা বলেছি, রাসু ওঁর কাছে কত বসেছে, শুয়েছে। কী কাণ্ড বলো তো। আমার তো ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে!

রাসুর মা এতক্ষণ হাঁ করে সব শুনছিল, এবার কথা বলে—তাই উনি কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে রাজী হন নি। কী কুচক্রে বুড়ো রে বাবা!

অজয় বলে—সত্যি। কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে চান না—যদি রোগটা ধরা পড়ে।

অজয়ের মা বলেন—শুনেছি বটে, এ সব রোগে রোগ লুকোবার চেষ্টা করে।

অজয় সত্যিই ভয় পেয়েছে, বলে—আমি ভাবছি, কাল গিয়ে নিজের বুকটা দেখিয়ে আসব, কী রকম একটা ঘুসঘুসে কাশি হয়েছে আমার।

রাসুর মা বলে—তবে বাপু রাসুটাকেও নিয়ে যেও। একবার দেখিয়ে এনো। কী কালসাপ পুষেছিলুম রে বাবা! এমন করে সর্বনাশ করলে!

—এখন কী করা যায় বলো তো?—বলে অজয়—ভারী ভাবনায় পড়লুম যে!

ভাবনা আবার কিসের! পষ্ট বলে দাও উনি ওনার জায়গা দেখুন। বলে রাসুর মা চলে যায়।

অজয় চুপ করে বসে থাকে। রাসু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও এটা বোঝে যে দাদুর একটা ভীষণ কী অসুখ হয়েছে। ও আস্তে আস্তে এসে অজয়ের কোলে বসে।

অজয় ওর মাথাটায় হাত দিয়ে বলে—একটা কথা বলি মনে রেখো।

—কী বাবা?

—মাস্টার মশাইয়ের ঘরের দিকে একদম যাবে না। মাড়াবে না ও-ঘর।

রাসু চুপ করে থাকে। কী বলবে বুঝতে পারে না।

অজয়ের মা বলেন—হাত ধুয়ে আয়। না হয় চান করে নে। আপিস যাবি নে?

—ধুত্তোর আপিস! এর একটা বিহিত না করে আপিস! কী যে বলো!

ওঠে অজয়। রাসু পেছন পেছন যেতে চায়।

রাসুর মা কোথা থেকে এসে রাসুর হাত ধরে টেনে একটা চড় বসিয়ে দেয়।—হারামজাদা ছেলে। ফের যদি ওদিকে গেছ—

রাসু চমকে থেমে যায়।

অজয় হনহন করে চলে যায় বাইরের ছোট ঘরটায়।

এসে সামনে জানালার তাকের ওপর বসে। তাকায় একবার চাটুজ্যের দিকে। চাটুজ্যে ঝিমোচ্ছিলেন। একবার চোখ মেলে তাকান।

একটু কাশতেই অজয় বোঁ করে পিছন ফিরে যায়। ও যেন দেখতে পায় মাস্টারমশাইয়ের কাশির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো জীবাণু কিলবিল করে ছড়িয়ে গেল বাতাসে। কোঁচার খুঁটে নাকটা চেপে ধরে ও।

চাটুজ্যের ভ্রূ দুটো কুঁচকে যায়। ঘোলাটে চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বেশি ভালো করে দেখতে গেলেও মাথাটা ঝিম ঝিম করে। বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছে শরীরটা। শরীরই বা বলা কেন, কয়েকখানা হাড় ছাড়া আর তো কিছুই নেই।

একটু পরে এপাশ ফেরে অজয়।

—কিছু বলবে ? —নিতান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন চাটুজ্যে।

—হুঁ। মানে—

অজয় যা বলতে এসেছিল সব গুলিয়ে যায়। মাস্টারমশাইকে কী করে ও অমন করে বলবে।

—ডাক্তারবাবু বলছিলেন আপনার ইয়ে টিউবারকুলোসিস হয়েছে। তা মানে ইয়ে আর কি—

চাটুজ্যের চোখে মুখে কোনো কৌতূহল নেই।

কাশির বেগটা আসতে উনি শুধু নিজের কাপড়টা মুখে চেপে ধরেন।

—তাই আপনার হল গে—এখানে তো একটু ইয়ে হচ্ছে, আপনি যদি একটু ইয়ে করে—

চাটুজ্যের কপালটা ঘেমে উঠেছে। হাঁটুর ভেতর মাথাটা নুয়ে পড়ে।

অজয় বসে থাকে। বুকটা ওরও কাঁপছে।

একটু একটু করে সময় কাটে। একটা শিশি-বোতলওলা চলে গেল। মুসলমান ডিমওলা একটা ঝুড়ি মাথায়।

সামনের প্রাসাদের থামের ওপর রোদটা পুরোপুরি পড়ল।

সময় কাটছে এক উত্তেজনাভরা নিস্তব্ধতায়।

চন্দ্রবদন চাটুজ্যে মাথা তোলেন।—ঠিকই বলেছ।

অজয়ের বুকে একটা মোচড় দেয়।—আপনি কিছু মনে করবেন না মাস্টারমশাই। আমার অবস্থা তো জানেন। আমি আপনার গে —এই গোটা পঞ্চাশ টাকা আপনাকে দেব। মানে, পথে যদি ইয়ে-টিয়ে কিছু—

দরজার পাশ থেকে চুড়ির শব্দ শুনতে পায় অজয়।

শব্দ হোক। অজয় বলে—বলেন তো যেখানে যাবেন সেখানে একটা টেলিগ্রাম করে—

চাটুজ্যে তাকান একবার। এই অজয় তাঁর ছাত্র।

মুখটা তুলে ভালো করে দেখেন অজয়কে।

বলেন আস্তে আস্তে ভাঙা গলায়—আজ নয়। কাল সকালে যাব।

—নিশ্চয় নিশ্চয়! কাল নয় তো কি একবারে ইয়ে বললেই ইয়ে! কোথায় যাবেন একটা খবর-টবর—

চাটুজ্যে নীরবে তাকান একবার অজয়ের দিকে।

অজয় আর কথা বলতে পারে না। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বাইরে এসে দেখে রাস্থর মা দাঁড়িয়ে আছে।

—পঞ্চাশ টাকা দোব যে বললে, টাকা কোত্থেকে পাবে শুনি?

—যাও যাও! ফ্যাচফ্যাচ কোরো না। মেজাজ ভালো নেই।

—তোমার মেজাজ নিয়েই তুমি থাকো। পষ্ট বলে দিলেই হত, যেখানে খুশি চলে যান।

অজয় রেগে ওঠে—তা বলা যায় না। তুমি বলো গে যাও।

—বলবই তো। বুড়োকে কি ছেড়ে দেব ভেবেছ।

—দোহাই তোমার। মানুষটাকে এখুনি মেরো না। বাইরে মরুক।

রাস্থর মা রান্নাঘরে চলে যায়। অজয় ওপরে চলে আসে। শরীরটা ওর কেমন যেন করছে। একটু না জিরিয়ে স্নান করতে পারবে না।

ক্রমে সকাল চলে গেল। দুপুর এল। অজয় ভালো করে স্নান করে খেয়ে একটু গড়াচ্ছে। মন ভার, মুখ ভার। রাস্থ আজ স্কুলে যায় নি। ও ঘরে ঠাকুরমার কাছে শুয়ে ছিল। ঠাকুমা একটু চোখ বুজতেই উঠে পড়েছে।

সকাল থেকে একভাবে শুয়ে আছেন চাটুজ্যে। শোবার উপায় নেই। শুতে গেলে কাশির বেগটা বেশি আসে। সকালে অজয়ের কথাগুলো খুব ধীর ভাবে গ্রহণ করেছেন উনি। এতে আশ্চর্য হবার কীই বা আছে। ছোটবেলা থেকে যা শরীর, আর বছর আঠারো আগে একবার প্লুরোসিসও হয়েছিল। টি. বি. হওয়াটাই যেন স্বাভাবিক ছিল। কষ্ট কিছু নেই। ভয়ই বা কী! শুধু এই যন্ত্রণাটা ওঁকে বড় বেসামাল করে তুলেছে।

মনে কষ্ট! মনে ব্যথা! ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যাস তাঁর বহুকাল নেই। ওগুলোর সম্পর্কটা মনেরই—আত্মার নয়। কথাটা এতকাল ধরে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন চাটুজ্যে--এতেও কি কিছুটা বুঝতে পারেন নি?

তা ছাড়া মনটাকেও এমন একটা নিরাসক্তির আওতায় এনে ফেলবার চেষ্টা করেছেন, যে সহজে তাঁকে টলানো যায় না।

তাই হয়তো এত যন্ত্রণা। অসহ্য জ্বালার পরীক্ষা।

চাটুজ্যে কিছুই ভাবেন নি এখনও। ভাবা যাবে। এখনও তো রাত্রিটা পড়ে আছে। তিনি আবার এক ফোঁটা ওষুধ খেলেন। যন্ত্রণা যদি একটু কমে। একটুও কমবে না?

—দাদু!

জানালার পাশ থেকে আওয়াজটা শুনে চমকে তাকান।

রাসু। মুখটা নীল হয়ে গেছে। জানালার গরাদ দুটো ধরে ডাকছে—দাদু! একটু বুঝি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চাটুজ্যের মুখ।

কিন্তু পরক্ষণেই ভীষণ একটা কাশির বেগ এসে সর্বশরীর কাঁপিয়ে দেয়। রাসুর দিকে তাকিয়ে কাপড়টা মুখে চেপে ধরেন।

হাত দিয়ে রাসুকে ইশারা করেন সরে যেতে।

রাম্ন কিন্তু সরে না।

কাশতে কাশতে চোখ ফেটে বুঝি রক্ত বেরোতে চায়। রক্তই। কাশির বেগ কমে এলে কাপড়টা নামিয়ে দেখতে পান রক্তই। আজ প্রথম দেখা গেল। প্রথম কিনা তাই বা কে জানে? হয়তো এর আগেও পড়েছে, চাটুজ্যে লক্ষ্য করেন নি।

—দাছু! এই নাও।

বলে কী একটা ছুঁড়ে বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে চলে যায় রাম্ন।

চাটুজ্যে তাকান। দুখানা বিস্কুট।

দুপুরে ও বিস্কুট কোথায় পেল। হয়তো সকালে ওর জলখাবারের পয়সায় কেনা। এতক্ষণ দিতে পারে নি। একটু ফাঁক পেয়ে দিয়ে গেল।

চাটুজ্যে মুখটা ভালো করে মোছেন কাপড়ে। কলে জল এলে রাস্তার কলে গিয়ে কাপড় ধুয়ে ফেলতে হবে। বাড়ির কলে যাওয়া যাবে না। যাবেনও না।

বিস্কুট দুটো তুলে নেন চাটুজ্যে। আস্তে আস্তে নিয়ে পকেটে রাখেন। পকেটের ভেতর থেকে বুকের হাড়ের ওপর বিস্কুটের স্পর্শটা ভারী নরম মনে হয়। চাটুজ্যে চোখ বোজেন বোধহয় একটু আরামে।

তিন

যেতেই হবে। কাল সকালেই চলে যেতে হবে। বসে বসে ভাবছেন চন্দ্রবদন চাটুজ্যে। রাত তখন অনেক। ঘড়ি তো নেই। সময়ের হিসেবই বা করে কে? দিনের পর রাত রাতের পর দিন যে কাটছে, এইটেই যেন ঢের। কাটতে আর চায় না। রাত এগিয়ে এলেই চাটুজ্যের ঘোলাটে চোখ দুটোয় আতঙ্কের ছায়া পড়ে। একটুও ঘুমোবার উপায় নেই; বসে বসে ঝিমোন আর কাশির অদম্য বেগ সামলান। আজ রাত্রে কাশির বেগটা যেন একটু কম।

হাতড়ে হাতড়ে মোমবাতিটা বার করেন চাটুজ্যে। কী কামড়াচ্ছে যেন। পিঁপড়ে? এ কদিন কোনো জ্ঞানই ছিল না। বোধ ছিল না শরীরে।

মোমবাতিটা জ্বালান চাটুজ্যে। আস্তে আস্তে কম্বলের ওপর হাত বুলোতে থাকেন। ভালো করে দেখবার চেষ্টা করেন। ছারপোকা। এত ছারপোকা! কতদিন ধরেই তো কামড়াচ্ছে ওঁকে।

দু-চারটে ছারপোকা মারতে গিয়ে শরীরটা কাঁপতে লাগল। থাক গে। মোমবাতিটার দিকে তাকালেন। নেভাবেন? না থাক, জ্বলুক। নিঃশেষ হয়ে যাক।

পকেট থেকে দশটাকার পাঁচখানা নোট বার করলেন। আজ বিকেলে দিয়ে গেছে অজয়। বোধহয় ওর শেষ গুরুদক্ষিণা। টাকা কটা রাখলেন অধ্যাত্ম রামায়ণের পাতার ভেতর।

ওষুধের বাক্সটা বার করলেন। ছোট ছোট শিশি, কী মিষ্টি ঠাণ্ডা শিশির গা। হাতের মুঠোয় গোটা চারেক শিশি নিয়ে এক নীরব আরামে বসে রইলেন কিছুক্ষণ কেটে গেল।

শিশিগুলো রাখলেন বন্ধ করে। মোমবাতিটা প্রায় শেষ হয়ে এল।

সামনের বিরাট প্রাসাদের মোটা মোটা থামের আড়ালে বোধহয় ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ। শুধু মিঠে মিঠে আলোর রেশ চোখে লাগে।

চাটুজ্যে বসেই আছেন। শুতে ভরসা পাচ্ছেন না।

বসে বসে ভাবছেন। কোথায় যাওয়া যায়?

কাল সকালেই তো বেরোতে হবে। কোথায় যাবেন?

অজয়ের দোষ নেই। তাঁকে চলে যেতে বলেছে বলে একটুও রাগ হচ্ছে না অজয়ের ওপর। ছেলেমানুষ। ভয় পাওয়া কিছু অন্যায় নয়। আর বৌমা? থাক গে ওদের কথা।

ভাবতে না চাইলেও মনের কোথায় যেন বার বার উঁকি দেয় একটি মুখ। রাসু। চোখভরা বেদনা আর আতঙ্ক। থাক গে, ওর কথা ভাববেন না।

না ভাবলেও বিগত চল্লিশ বছর ধরে বহু চিন্তা বহু ভাবনার ফাঁকে আর একখানি মুখও তাঁর মনে ভেসে ওঠে। সে মুখ আর মন থেকে মুছতে পারলেন না চাটুজ্যে আজ পর্যন্ত।

সে মুখের বড় বড় একজোড়া চোখ ওর সমস্ত সত্তাকে কখন গ্রাস করে ফেলে উনি জানতেও পারেন না। সে চোখের বেদনা মোছানো যায় না। ভাসা-ভাসা বেদনার তলায় গভীর মমতায় ভরা চোখ দুটি ভুলতে পারলেন না চাটুজ্যে। ধ্যানে ডুবে যান মাঝে মাঝে। ওই চোখের গভীরে ডুবে যান। এ কথা কিন্তু সেও জানে না।

এ ওঁর একান্ত গোপন সম্পদ। আজীবন এই ধ্যানটুকু গোপন

করে রেখেছেন। এইটাই তো জীবনের একমাত্র পাওনা হয়ে রইল। আর সবই তো দেনা।

তিনটে শনিবার কেটে গেছে। তার কাছে যেতে পারেন নি চাটুজ্যে। আজ বার বার তার কথাই মনে পড়ছে। নিজেকে কিছুতেই হালকা করতে পারছেন না। সর্ব শরীরে সর্বনাশা জীবাণুর দংশন। বাইরে ছারপোকার দংশন। জ্বালায় ভরে গেছে সর্বশরীর। ওদেরই বা কী দোষ! জীবাণুরা তো জানে না তারা কোন শরীরে কতখানি ক্ষতি করে। যক্ষ্মার জীবাণু কি জানে যে তাদের আহ্লাদিত দমনে চাটুজ্যের কী জ্বালা!

এতক্ষণে একটু হাসি পায় চাটুজ্যের।

ওরা জানে না। কোন ফুসফুস পেলে সেটাকে দংশন করাই ওদের ধর্ম। ওইখানেই ওরা বাসা বাঁধে। বাইরের ওষুধে সে বাসা ভাঙবার চেষ্টা যদি মানুষ করে, বাসা ভেঙে যায়। ওরা বাঁচবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওষুধের ক্রিয়ায় হয়তো বা মরে যায় হতাশ হয়ে।

বোঝে না, কেই বা মারল, কেনই বা মারল!

অপূর্ব! চাটুজ্যের চিন্তার সূক্ষ্ম ধারা কোথায় গিয়ে প্রবেশ করছে চাটুজ্যে নিজেই বুঝতে পারেন না। মনে মনে হাসিই পায়।

বিশুষ্ক ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয় কৌতুকে। এ কী মারাত্মক কৌতুক!

কী আশ্চর্য লাগে ভাবতে। কারো দোষ নেই। কারো না।

যক্ষ্মার জীবাণুর নয়, তাঁর নিজের নয়, অজয়ের নয়, রাসুর নয়, আর—আর তরুবালারই বা কী দোষ?

তরুবালা!

না। তরুবালারও দোষ ছিল না।

তিরিশ বছর আগে দেশে গিয়ে সেই সন্ধ্যায় যখন তিনি শুনলেন তরুবালা গৃহত্যাগ করেছে জমিদারের নায়েবের ছেলের সঙ্গে, সেদিনও তরুবালাকে তিনি দোষ দেন নি। কেনই বা দোষ দেবেন। তরুবালার হয়তো ও ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

বুকটা ভেঙে গেল যেন। সামনের গাছপালা মাঠ ঘাট চোখের সামনে যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল। তবু তিনি দোষ দিতে পারলেন না। তরুবালার কোনো দোষ নেই।

আজ মৃত্যুর কাছাকাছি এসে আরও আগের সব কথা বার বার করে মনে পড়ছে। দোষ কি তাঁরই হয়েছিল?

তরুবালা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করেছিল। তরুবালা তাঁকে কতবার চিঠি লিখেছিল। কিন্তু সেদিনের চন্দ্রবদন চাটুজ্যে একখানা চিঠিরও উত্তর দিতে পারেন নি। কেন? তাঁরই কি দোষ?

না। দোষ তাঁরও নয়। তবে কি যেদিন সন্ধ্যায় তরুবালা প্রথম তাঁকে বলেছিল?

কী বলেছিল? ভালো করে মনে করার চেষ্টা করেন চাটুজ্যে।

কতকালের কথা। তখন তাঁর বয়সই বা কত! বছর আঠারো, আর তরুর তেরো। কিন্তু তেরো বছরেই তরুর দেহ কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। যৌবনের প্রথম প্রহর। এমনিতেই তরুর দেহটি ছিল সম্পূর্ণ স্নিগ্ধতায় ভরা। রঙ ময়লা। মুখখানি গোল। নাকটি চাপা আর নাকের দুপাশে দুটি মস্ত চোখ। বেশ বড়সড় বাড়ন্ত গড়ন। তরুবালার রূপে সব মিলিয়ে ছিল এক অপরূপ স্নিগ্ধতা।

চন্দ্রবদন ফরসা। রোগা, চিররুগ্ন দুর্বল।

বেশির ভাগ সময়টাই কাটত ঘরে। মা বাইরে বেরোতে দিতেন

না। বাইরে বেরুলে যদি ঠাণ্ডা লাগে। ঠাণ্ডা লাগলেই, কাশ আর হয়তো বা জ্বর। এ জন্মের শরীরটা চিরকালই এমনি ধারা।

স্কুলে সেবার শেষ বছর। চন্দ্রবদন পড়াশুনায় মোটামুটি ভালো। তাই বাড়িতে বসে শুধু পড়ত। স্কুলে যেত, আর স্কুল থেকে সোজা বাড়ি। মাঠ নয়, খাল নয়, বিল নয়, কোথাও নয়। মায়ের বারণ।

আর খেলাধুলোয় যাবেই বা কী! মাঠে একটা বল যদি জোরে এসে গায়ে লাগে, তবে ওকে আর বাঁচতে হবে না। এত পাতলা দুর্বল দেহ।

তরুবালা ওদেরই প্রতিবেশীর কন্যা। ছোটবেলা থেকে চন্দ্র বাইরে বেশি বেরোত না। মেয়েরা তাই খেলায় নিত ওকে। বিশেষ করে তরু।

ছবি হয়তো বললে—চন্দরকে ভাই খেলায় নোব না।

তরু জেদ করে বলত—আমি নেব। ও আমার দলে খেলবে।

পাঁচুমণি হয়তো বলত—দূর, চন্দরটা একেবারে ঝাঁটার কাঠি। ধাক্কা মারলে পড়ে যায়। যা চন্দর, তোর দ্বারা হবে না।

চন্দরের পাণ্ডুর মুখটার দিকে তাকিয়ে তরু এসে ওর হাতখানা খপ করে ধরে পাঁচুমণিকে বলত—না। ও যাবে না। ও যাবে কেন শুনি। ও চলে গেলে আমিও খেলব না। এসো চন্দরদা, আমরা টুলু খুকু ওদের বাড়ি গিয়ে খেলব।

চন্দ্রকে টানতে টানতে নিয়ে যেত তরু।

চন্দ্র হয়তো ম্লান মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলত—আমি না হয় বাড়ি যাই। তুই ওদের সঙ্গেই খেল।

—না।—বলে প্রায় ধমকে উঠত তরু।

চন্দ্রকে নিয়ে চলে আসত টুলুদের বাড়ি।

এসে কিন্তু টুলুকে পাওয়া যায় না। টুলু হয়তো অন্য কোথাও

খেলতে গেছে। চন্দ্র মুখটা আরও ম্লান করে বলত—মিছিমিছি তোর খেলাটা নষ্ট হল।

তরু ওর হাত ধরে বলে—চলো, লিচুতলায় যাই।

—কী হবে?

—চলো না। অনেক লিচু হয়েছে।

চন্দ্রকে টানতে টানতে নিয়ে আসে ওদের বাড়ির পাশে একটা পুকুরের ধারে লিচুগাছের তলায়। ভেবেছিল, সেখানে হয়তো দু-চারজন খেলার সঙ্গী পাবে। কই, কেউ নেই।

—লিচু পাড়ো। ওঠো।—বলে তরু।

চন্দ্র মহা ভাবনায় পড়ে। গাছের ওপর উঠলে ওর মাথার ভেতরটা কেমন করে। গাছের ওপর থেকে নীচের দিকে তাকালে তো, মাথাটা ঘুরেই যায়।

—কী হল? ওঠো।

চন্দ্র একবার গাছের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে—গাছে ওঠা, মানে আমি তো তেমন—ও আমি ঠিক পারব না।

খিলখিল করে হেসে ওঠে তরু—সে কি গো! আমি উঠব?

চন্দ্র হেসে বলে—তুই ওঠ।

—কী যে বলো। মেয়ে হয়ে আমি গাছে উঠব। তুমি কেমন পুরুষ মানুষ!

চন্দ্র হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তরুর দিকে। মেয়ে! পুরুষ! এ-সব কথায় ওর মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায়।

—তুমি বিয়ে করলে কী করবে গো?

কী করবে? কই, চন্দ্র তো এ সব কথা কখনও ভাবে নি। বিয়ে করবে চন্দ্র? কে জানে?

—একটা তুখোড় মেয়ে বিয়ে না করলে তোমার কপালে যে কত দুঃখু আছে।

তা হয়তো আছে। তুখোড় মেয়ে মানে? কার মত? তরুর মত?

চন্দ্র মনে মনেই ভাবে, একটা কথাও বলতে পারে না।

—কী যে হাঁ করে তাকিয়ে থাক। নাও আমার কাছে এসো। তোমার কাঁধ ধরে এই ডালটায় উঠব।

কাঁধ মানে তো হাড়! তরুর বাড়ন্ত ফাঁপালো দেহটির ভার কি ওর কাঁধের ওই সরু হাড় বইতে পারবে? চন্দ্র এগিয়ে এল চুপ করেই।

তরু গাছে উঠল দুরন্ত গেছো মেয়ে তরু।

চন্দ্র হাঁ করে তাকিয়েই থাকে।

তরু গাছে উঠে পটাপট লিচু ছিঁড়ে ওর দিকে ছুঁড়ে মারে।—ধরো।

চন্দ্র লিচু কুড়োতেই ঘেমে ওঠে! তবু তরুর পাল্লায় পড়ে ওর আর উপায় নেই।

—কত হল?

—গুনি নি তো!

—গুনতেও জানে না! তরু ধমকে ওঠে।

চন্দ্র মুখটা ম্লান করে দাঁড়িয়ে থাকে।

তরু নামছে এবার।— কাছে এসো। নইলে পড়ে যাব।

কাছে? ওরে বাবা! ওই মেয়ে যদি লাফিয়ে পড়ে চন্দ্রের ঘাড়ে, ও গুঁড়ো হয়ে যাবে।

—কই, এলে কাছে?

এক পা এগিয়ে দু পা পিছিয়ে যায়।

—আরে এসো। পড়ে যাব!—ডাল ধরে ঝুলছে তরু।

এগোয় চন্দ্র। প্রায় চোখ বুজে এগোয়। তরু যেমনি হাতটা ছেড়ে দিয়েছে, টুক করে সরে আসে চন্দ্র।

তরু কাত হয়ে পড়ে যায় মাটিতে।

তরু নেমেই ওর কাছে এসে কাঁধটা ধরে ঝাঁকানি দেয়—উঃ! কোমরে ঘা লেগেছে। তুমি কী?

চন্দ্র ভয়ে ভয়ে তাকায়।

গা হাত পা ঝেড়ে-ঝুড়ে তরুবালা ওঠে। চন্দ্রর কাছে এসে বলে—কই লিচু?

—কোঁচড়ে।—চন্দ্র এতক্ষণ কথা বলতে পারে।

—চলো। ওই পুকুরধারে বসে খাই আমরা।

চন্দ্র ওর সঙ্গে গিয়ে পুকুরধারে বসে।

তরু পা ছড়িয়ে বসে একটা লিচুতে কামড় দিয়ে বলে—উঃ! কী টক! দুর দুর! বলে রেগে সব লিচু ফেলে দেয় পুকুরে।

—যত জ্বালা আমার! খেলা হল না, আছাড় খেলুম, কোমরে লাগল! লিচুগুলো ছাই! কেন যে এত জ্বালা!

বলতে বলতে তরুবালা চন্দ্রকে একা ফেলে হনহন করে চলে যায়।

জ্বালা! জ্বালাই বটে। ছোটবেলা থেকেই জ্বলছে তরুবালা। চন্দ্রকে নিয়েই জ্বলছে কি? না, তার জীবনের অনেক আগুন। তার ভেতর হয়তো বা একটা বড় নীল শিখা চন্দ্রবদন।

রাত বেড়ে যাচ্ছে। চন্দ্রবদন চাটুজ্যে বসে আছেন তেমনি। মোমবাতি জ্বলে জ্বলে নিভে গেল। মোমবাতিটা নিভল বটে, কিন্তু আলো তো দিয়ে গেল।

চাটুজ্যের এই অন্ধকার জীবনে তরুবালার আলো না পেলে আজ কী হল কে জানে। বুঝলেন চাটুজ্যে। আজও বোঝেন, কিন্তু

করতে কিছু পারেন নি। বোবা হয়ে ম্লান হয়ে থাকা, এই বুঝি ওঁর এ জন্মের কাজ।

চাটুজ্যে কেন যে সব বুঝেও কিছু বলতে পারেন না, সেটা কি তিনিই ঠিকমতো জানেন? মনের ঠিকানা পাওয়া ভার! তবু এই মনে ডুবে থেকেই জীবনটা কাটতে চলল। ঠিকানা মিলল না। শুধুই হাতড়ে বেড়ানো।

স্পষ্টই বলেছিল তরুবালা। এর চেয়ে স্পষ্ট আর হয় না। তেরো ছাড়িয়ে চোদ্দ বছরের নাগালে এসেছে তরুবালা। চতুর্দশীর অম্লান চাঁদের মতো তরুর যৌবন। চন্দ্র সেবার এনট্রান্স পরীক্ষা দেবে। তখনই স্পষ্ট করে বললে তরু। তার আগেও হয়তো ইঙ্গিতে বলেছে। কাছে এসেছে, বসেছে। চন্দ্রের মুখের কাছ থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে রেগে।

চন্দ্র অবাক হয়ে বলেছে—কী হল?

—দিন-রাত্তির বই মুখে আমার ভালো লাগে না।—রাগ করে বলেছে তরু।

চন্দ্র অবাক হয়ে বলেছে—তবে কী করব?

—ছাই করবে। গল্প করো।

—কী গল্প করব?

তরুবালার মুখটা রাগে গম্ভীর হয়ে গেছে, বইখানা কুড়িয়ে এনে হাতে দিয়ে বলেছে—নাও, পড়ো।

বলে চলে যেতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। আশা করেছে চন্দ্র হয়তো কাছে এসে ওর হাতটা ধরে বলবে—রাগ করিস নে তরু।

কাঁচকলা! চন্দ্র বইয়ে মুখ রেখে পড়তে শুরু করেছে আবার।

রাগে আর ক্ষোভে বেরিয়ে গেছে তরু। তিন-চার দিন আর আসেই নি। আসে নি বলে চন্দ্র একবারও তাদের বাড়ি যায় নি। আবার তরুকেই আসতে হয়েছে। চন্দ্রর মা হয়তো বেরিয়ে গেছেন ধান ভানতে, সেই ফাঁকে ঘরে এসে চুপ করে বসেছে।

ঘরে এসে চুপ করে বসেছে।

চন্দ্র লিখছিল। মুখ তুলে বলেছে,—কদিন যে আসিস নি।

যাক। তবু কথাটা বলল চন্দ্র। সে যে আসে নি সেটা খেয়াল আছে।

মনে মনে খুশী হলেও মুখটা গম্ভীর রেখেই বলেছে তরু,—কারু পড়া নষ্ট করতে এসে কী লাভ?

চন্দ্র একটুখানি হেসে বলেছে;—তুই এলে তো পড়া নষ্ট হয় না।

তরু খুব খুশী। তবু মুখে বলে,—কই, একবার তো খোঁজ নিতে যাওয়াও হল না। মরল কি বাঁচল।

—খোঁজ!—চন্দ্র অতটা ভাবে নি। একটু চুপ করে থেকে বলে—মানে, পরীক্ষা তো সামনে।

—তার মানে এ ক-দিন আমার কথা ভাব নি। আসতে তবে মনে পড়ল।

চন্দ্র হেসে বলে,—ঠিক ধরেছিস তো! ঠিকই, মাথায় আসে নি তোর কথা।

—অ!—তরুর মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। রেগে বলে—মাথায় ঘি থাকলে তো ভাববে! আছে তো গোবর! তা নইলে এত পড়েও তো কোনোমতে পাশ কর।

চন্দ্রর মুখটা শুকিয়ে যায়। বলে না কিছু।

—একটু রাগতেও জান না।—বলে বেরিয়ে যায় তরু।

চন্দ্র ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, তরুবালা কী বলতে চায়। কিছু একটা বলতে চায় এটা বোঝে। কিন্তু সেটা কী? হয়তো বা ইচ্ছে করেই বোঝে না ওর সচেতন মন, যে কথা ওর মনের তলায় হয়তো পরিষ্কার ভেসে আছে।

চন্দ্র বোঝে না। কোনো কালেই বুঝল না। তাই তরুকে সেদিন অত স্পষ্ট করে বলতে হল।

লক্ষ্মীপুজোর পরদিন। সেদিন থিয়েটার হচ্ছিল গাঁয়ে। সবাই গিয়েছিল শুনতে। চন্দ্রর মা'ও গিয়েছিল। তরুবালাদের বাড়ির সবাই গিয়েছিল। চন্দ্র যায় নি। ওর রাত জাগা সয় না। তা ছাড়া সামনে পরীক্ষা।

ঘরে একা একা শুয়েছিল চন্দ্র। অন্ধকারে দোরটা ভেজিয়ে শুয়েছিল। ভাবছিল? না। কিছুই ভাবছিল না।

শরীরটা ওর যেমন হালকা, মনটা ওর তার চেয়েও বেশি হালকা। ভাবনা চিন্তা সয় না, ভাবতে ভালোও লাগে না। চুপ করে শুয়ে থাকতে বেশ লাগে। অন্ধকারে শুয়ে থাকতেই সবচেয়ে ভালো লাগে। দেহটাকে ছড়িয়ে দেয় বিছানার ওপর, একেবারে এলিয়ে।

রাত আর কতই বা। তবু মনে হয় বড় নিস্তব্ধ। থিয়েটারে গেছে সব। ওর ঘরটা কুয়োর পাশেই। কুয়োর পাশে একটা মস্ত পেঁপে গাছ। জানলা দিয়ে দেখা যায়।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে থাকে চন্দ্র। এখনও ঘাড়টা ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ দোরের শব্দে চমকে ওঠে

—কে?

মূর্তিটি এগিয়ে আসে দোরটা ভেজিয়ে।

চন্দ্রের গা ছমছম করে। তবু আর একবার বলে—কে?

—আমি।

গলার স্বরটা তরুর। ততক্ষণে তরু সামনে এসে পড়েছে।

—তুই? আলোটা জ্বালি।

হাতটা ধরে তরু বলে,—না।

চন্দ্রর একটু কেমন কেমন লাগে। তবু কিছু বলে না। তরু পাশে বসে ওর গা ঘেঁষে।

চন্দ্র একটু সরে বসতে চায়। তরু ওর হাতটা চেপে ধরে আরও কাছে টেনে আনে। তরুর হাতের পাতা ঘামে ভিজে।

চন্দ্র বাধা দেয় না। আস্তে আস্তে বলে;—থিয়েটারে যাস নি?

তরুর ফিসফিস গলা,—গিয়েছিলাম।

—তবে?

—চলে এলাম।

—কেন?

—একটা কথা ছিল।

চন্দ্র একটু চমকে ওঠে, হঠাৎ কিছু বলতে পারে না।

একটু ভেবে বলে—আমার সঙ্গে কথা? কী বলবি বল?

তরু ওর হাতখানা কোলের ওপর রাখে,—একটা কথা শুনেছ?

—কী?

—আমার বিয়ের কথা?

—ও, হ্যাঁ। শুনছিলুম বটে।

—এ বিয়ে আমি করব না।

—কেন রে?

—না।

চন্দ্রর বুকটা কাঁপে কী একটা আশঙ্কায়,—কেন?

—না। বিয়ে একবারই করেছি। মনে মনে।

—মনে মনে! কবে? কাকে?

—অনেকদিন আগে। —বলে হঠাৎ তরু চন্দ্রের বুকের ওপর মাথাটা রাখে। তারপর আস্তে আস্তে বলে আবার,—অনেকদিন আগে—তোমাকে।

চন্দ্রের বুকের শব্দটা তরু শুনতে পাচ্ছে না তো! ভয়ে চন্দ্রর হাত-পা ঘামতে শুরু করেছে। গলা দিয়ে স্বর আর বেরুতে চায় না। তবু বলে,—আমাকে? আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। কী বলছিস তুই?

—ঠিকই বলছি। তোমাকে বর বলে ভেবেছি ছোটবেলা থেকে। তুমি কী করে জানবে? দেখবে, চোখ আছে? না আছে চোখ, না আছে একটু বুদ্ধি আর বল। এই জ্বালাতেই তো—

তরুবালার গলাটা ধরে আসে। চন্দ্রের বুকের ওপর নিজের পাউডার-মাখা গাল ঘষতে থাকে। চন্দ্র কথা বলতে পারে না। বলবেই বা কী? সব গুলিয়ে যাচ্ছে ওর মাথায়। তরু ওকে ভালোবাসে। কই কখনও তো ঠিক বুঝতে পারে নি ও! তা ছাড়া, তার মতো একটা রোগা ছেলে। দেখতেও চন্দ্র মোটেই ভালো নয়। তরুর মতো মেয়ে তাকে যে ভালোবাসবে এ কথা ভাবতেই মাথাটা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে ওর। চন্দ্র কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

তরুর দেহের স্পর্শটা ওর স্বপ্নেরও বাইরে ছিল। নরম সুঠাম দেহটি ওর বুকের ওপর। ভয়ে কাঠ হয়ে ছিল চন্দ্রবদন।

তরু নিশ্চিন্ত আরামে বলে,—আমার যা বলবার বললুম। এখন তুমি যা হোক করো।

—কী করব?—বলতে গিয়েও বলতে পারে না চন্দ্র। গলায় আটকে যায়। অনেকক্ষণ সময় পেরিয়ে যেতে থাকে।

তরু আর একবার বলে,—তা হলে কী করবে?

চন্দ্র কোনোমতে বলে,—ভাবছি।

মনে মনে ভাবে, মা এসে পড়লে বাঁচি। থিয়েটারটা ভাঙতে আর কত দেরি? এখনও কি থিয়েটার ভাঙবে না? আরও কিছুক্ষণ পরে তরু বলে,—কী ভাবলে?

—ভাবছি। আবার বলতে হয় চন্দ্রকে।

রাত অনেক হয়ে গেছে! কিছুদূরে বেশ গোলমাল শোনা যায়। থিয়েটার কি তবে ভেঙেছে?

তরুবালা উঠে পড়ে। মানুষের কলরব ক্ষীণ থেকে জোরালো হয়ে আসে। তরুবালা দাঁড়ায়। চন্দ্র উঠে বসে। তরুবালা ওর সামনে ঝুঁকে ওকে একবার ঝাঁকিয়ে বলে,—কই, কিছু বলো।

চন্দ্রর ভেতরটা যেন ঝনঝন করে ওঠে ঝাঁকানিতে।

—কাল বলব।

—কখন?

—সন্ধ্যেবেলা।

তরুবালা আর দেরি না করে দোরটা খুলে মুহূর্তে বেরিয়ে যায়। ততক্ষণে মানুষের গলার স্বর কাছাকাছি শোনা যাচ্ছে। চন্দ্র কাঠের মতো বসে থাকে। তখনও শরীরটার ভেতর ওর কাঁপুনি থামে নি। কী একটা স্বপ্ন দেখল চন্দ্র। স্বপ্নটার আস্বাদের উত্তেজনা ভোলা যায় না। অথচ বিয়ের কথা ভাবতে কাঁপুনি ধরে।

কী ছেলেমানুষিই না করা গেছে! আজ মনে মনে একটু না হেসে পারেন না চাটুজ্যে! ছেলেমানুষি ছাড়া আর কীই বা বলতে পারেন তিনি।

তরু তখন ছেলেমানুষ। নইলে তার মতো ছেলের কাছে এসে তখন ওই কথা কখনও বলত! তরু কী করে জানবে যে বিয়ের দায়িত্ব নেবার মতো উপযুক্ত ছিলেন না চাটুজ্যে।

তবু ভেবেছিলেন চাটুজ্যে। আজও ভাবছেন। সামনে প্রাসাদের থামগুলো অন্ধকারে পাষাণছায়ার মতো ভারি. ঠেকছে চোখে। অধ্যাত্ম রামায়ণের ওপর আর-একটা মোমবাতি রাখেন চাটুজ্যে। সেটাও জ্বালান। জ্বলুক। মোমবাতি জ্বালাতে ওঁর বড় ভালো লাগে। ছোট ছোট মোমবাতি একপয়সায় একটা। জ্বালাতে বেশ আরাম লাগে চাটুজ্যের।

বসে থাকেন তেমনি। আজ সেই তরুবালা কোথায়! সেদিন যদি তরুকে বিয়ে করতেই চন্দ্র চাইত, তরুর বাপ-মা কি বিয়ে দিত? কখনই নয়। তবুও চন্দ্র রাজী হবে কি রাজী হবে না ভেবে কূলকিনারা পেল না সমস্ত রাত। একটু পরেই মা এল। চন্দ্র তখনও বসে।

—কিরে, ঘুমোস নি?

চন্দ্র একবার তাকাল শুধু। মা আলো জ্বাললেন।

আলোয় মায়ের মুখখানি ভালো করে দেখতে পেয়ে চন্দ্র একটু যেন আশ্বস্ত হল।

—ঘুমোস নি কেন?

—এমনি—বলে আবার শুয়ে পড়ল চন্দ্র। কিন্তু ঘুম আর এল না। সমস্ত রাতটাই জেগে কাটল। মাথাটায় সব গুলিয়েই গেল।

শুধু তরুবালার দেহ স্পর্শের কথা স্মরণ করে মাঝে মাঝে এক আশ্চর্য অনুভূতিতে স্নায়ুগুলো বিকল হয়ে যাচ্ছিল ওর। তাতে হল আরও বিপদ। চিন্তা করবার মতো কোন মুহূর্তই এল না সমস্ত রাত। সব এলোমেলো। সব ধোঁয়া-ধোঁয়া।

ভোরের দিকে ঘুমোল চন্দ্র। উঠল বেলায়।

দুপুরে ঘরে বসে পড়ল না। বেরিয়ে গেল বাইরে।

মা বললেন—পড়বি নে আজ ?

জামাটা পরে বেরোতে বেরোতে বললে চন্দ্র,—পরেশদের বাড়ি গিয়ে পড়ব।

পরেশ সহপাঠী। কিন্তু তাদের বাড়ি চন্দ্র গেল না।

বেরিয়ে সোজা চলল মাঠের সড়ক ধরে। সেখান থেকে বাঁ দিকে ভাঙা ডাক বাংলো। সামনে খেত। ডাক বাংলোর ভাঙা বারান্দাটায় বসে পড়ল চন্দ্র। সামনে মাঠ প্রায় সীমাহীন। সীমারেখা যেখানে দেখা যায়, সেটা দীঘলপুর। ওখানে যাত্রা দেখতে যায় সবাই কখনও কখনও। খুব নামকরা যাত্রাওলা থাকে ওখানে। ওখানে কি হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া যাবে এখন ? এই রোদ্দুরে ?

চন্দ্র নিজের মনে হাসে। কী অনর্থক ভাবনা করছে সে। আসল ভাবনাটা কেন আসছে না ওর মাথায়! তরুবালার কথা। তরুবালার ভাবনা।

না। কিছুতেই ও গুছিয়ে ভাবতে পারছে না।

সমস্ত দিনটাই কেটে গেল ডাক বাংলোয়। ও যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত হয়ে এসেছে। এসে মাকে বলল,—ভাত দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।

ভাত খেয়ে কাঁথাটা মুড়ে চোখ বুজল। তবু মাঝে মাঝে আতঙ্কিত

হতে লাগল তরুর আসবার ভয়ে। এই বুঝি এল তরু! নিশ্চয়ই এখুনি আসবে।

এসে যদি জিজ্ঞেস করে, কী ভাবলে? সে কী জবাব দেবে? ভাববার আপ্রাণ চেষ্টা করেও তো ভাবতে পারে নি বিশেষ কিছু। কী করে কী করা যাবে? ভাবতে যাওয়াটা প্রায় বৃথা। কিছুই হয়তো করা যাবে না।

কিন্তু তরুর মুখের সামনে ও দাঁড়াবে কী করে। ভয়ে মুখটাও ঢেকে নেয় কাঁথায়। যদি এসে পড়ে কিছুতেই ওর ঘুম ভাঙবে না। খুব ঠেললেও নয়। ঘরে আগুন লাগলেও নয়।

ও ভীষণ ঘুমোচ্ছে। কান দুটো বড্ড গরম ঠেকছে। আবার কাঁথাটা মুখের ওপর থেকে তুলে নেয়। চোখ দুটো জোর করে বুঁজে রাখে।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তরুবালা রাত্রে আসে নি তাহলে। পরের দিনও অমনি পালিয়ে বেড়াতে হয়। তারপর দিনও। তারপর দিন বাড়ি ঢুকতে গিয়ে একেবারে তরুর সামনে। ও হকচকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। তরু একটু হাসে। হাসিটা এখনও পরিষ্কার মনে আছে চাটুজ্যের। তারপর কাছে এসে বলে—কাল আমার আশীর্বাদ।

—অ!—বলে বাড়ি ঢুকে যায় চন্দ্র। পিছন ফিরে একবার তাকায়ও না।

কে জানে তরু হয়তো সেখানেই চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গিয়েছিল। তরুর দীর্ঘশ্বাসই বোধকরি ওর জীবনের একমাত্র পাওনা।

তারপর?

তারপরের কথা অতি সাধারণ। তরুরও বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন রাত্রে নিমন্ত্রণে গিয়েছিল চন্দ্র বোবার মতো। বোবার মতোই তাকিয়ে দেখছিল, পাবনার এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে তরুর বিয়ে হয়ে গেল। চন্দ্রের চোখে কোনো ভাষা ছিল না। বুকের ভেতরটায় কী একটা যেন চাপা ছিল।

বিয়ের পর অনেক রাত্রে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়ল। শুয়ে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। পাবনার ভদ্রলোকের পাশে তরুর বিষণ্ণ মুখখানা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওর চোখের কোণ বেয়ে কখন যে জল নেমে এল ও জানে না। গাল ভিজে গেল চোখের জলে। এই প্রথম কাঁদল চন্দ্র। অনেক রাত পর্যন্ত কাঁদল।

চার

চাটুজ্যের মোমবাতিটা ফুরিয়ে এসেছে আবার। আবার যেন সমস্ত শরীরটা ঝাঁকানি দিয়ে একটা অদম্য কাশির বেগ আসছে। বুক বাঁ হাতে চেপে নুয়ে পড়লেন চাটুজ্যে। স্বপ্নের মতো দেখছেন তিনি তরুর জীবনের কথা। বার বার একটা কথাই শুধু মনে হয়েছে, এতদিন তাঁর কি কোনো দোষ ছিল না? নিজের বিচার নিজে করে উঠতে পারেন নি ষাট বছর ধরে। এমন এক পঙ্গু জীবনের বিচার হয় না। হলেও সে বিচারের দণ্ড পাবার মতো সামর্থ্যই বা কোথায়। তারপর?

মোমবাতিটার দিকে তাকান চাটুজ্যে। তারপর?

তারপর গ্রামের স্কুল ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল। মাঝে তরু কয়েকবার শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছিল, কিন্তু চন্দ্র ওর কাছে যায় নি। তরু চন্দ্রর কাছে আসে নি। সিঁথিতে খুব মোটা করে সিঁদুর দিয়ে একদিন এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করে গেল শুধু। চন্দ্র ঘরে বসে দেখল। তরুও দেখল। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলল না। এগিয়ে এল না।

চন্দ্র কলকাতায় চলে এল চাকরির চেষ্টায়। শেষ সম্বল গয়না কখানা বেচে ওর মা পাঠালেন ওকে কলকাতায় অনেক আশা করে।

আশা শুধু আশাই। সফল হয়তো হয়। আবার হয়ও না। চাকরি চন্দ্র পেল না। ওখানে এক হোমিওপ্যাথি স্কুলে ভর্তি হল। হোমিও ডাক্তার হয়ে গাঁয়ে বসলে কিছু রোজগার হতে পারে। হোমিওপ্যাথি পড়তে ওর বেশ ভালোও লাগছিল। মন দিয়েই পড়ছিল চন্দ্র।

বছর দেড়েকের মাথায় একবার গ্রামে এল। কয়েক বিঘে জমি বিক্রি না করলে আর চালানো যাচ্ছে না। জমি বিক্রির বন্দোবস্ত মা-ই করেছিলেন। তবু একবার এল। টাকা নগদ নিয়ে যাওয়াই ভালো। অনেকদিন পর গ্রামে এসে প্রথম দুদিন বেশ ভালোই লাগছিল। তৃতীয় দিনে ও ভোরে উঠে দেখতে পেল বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে মা। কী হল? গায়ে হাত দিয়ে দেখে ভীষণ জ্বর।

মায়ের শরীরটাও এবার বেশ কাহিল লাগছিল ওর চোখে। তার ওপর জ্বর দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল চন্দ্রর।

মা ওর দিকে তাকিয়ে বললেন,—তরুর মাকে একবার ডাক। ওখানে তোর খাবার কথা বলে দিই।

চন্দ্র বেরোল।

তরুর মায়ের সঙ্গে দেখা করাও হয় নি আসবার পর। ওদের বাড়ি যেতে বড় একটা চাইত না চন্দ্র তরুর বিয়ের পর। তবু আজ যেতেই হবে।

তরুদের বাড়ির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল চন্দ্র। এ কী দেখছে সে! একথা তো কেউ বলে নি তাকে। মাও বলেন নি। হয়তো বলবার মতো কথা নয় বলেই বলেন নি। চন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখছিল। তরু আসছে। ঘাট থেকেই ফিরছে। হাতে ভিজে কাপড়ের বোঝা। স্নান সেরেছে। চুল থেকে টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে। কী যেন কেন, আজ চন্দ্রই কাছে এগিয়ে গেল। মাথায় সিঁদুর নেই। হাতে শাঁখা নেই। চুলপেড়ে ধুতি পরনে। এই কি সেই তরুবালা! চন্দ্র সামনে এসে দাঁড়াল।

তরু আজও হাসল। রাগ করে চলে গেল না। হেসে খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—কবে এলে?

—পরশুর আগের দিন—ধীরে ধীরে বলল চন্দ্র।

হঠাৎ যেন আরও হাসল তরু—খুব অবাক হয়েছ, না?

চন্দ্র অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তরুর হাসি বড় মারাত্মক। বুক ভেদ করে ঝঙ্কার তোলে।

—চলো আমাদের বাড়ি।

নীরবে চন্দ্র ওর পিছন পিছন এল। এতটা পথ আসতে আসতে খানিকটা সামলে নিয়েছে চন্দ্র। বললে—মায়ের খুব জ্বর।

—তাই নাকি!

—খুড়ীমাকে একবার ডেকেছে মা।

তরু বললে,—তবে তুমি যাও। আমি এখুনি মাকে ডেকে নিয়ে আসছি।

এক মুহূর্তে সহজ হয়ে গেল। চিরকালই এমনি সহজ ও। চন্দ্র কেন যে সহজ হতে পারল না তা কি ছাই চন্দ্রই জানে।

চন্দ্র ফিরে আসবার একটু পরেই তরু এল ওদের ঘরে।

চন্দ্রর মায়ের গায়ে হাত দিয়ে চন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললে,—ওমা,গা যে পুড়ে যাচ্ছে! মা একটু পরে আসবে। আমায় পাঠিয়ে দিলে।

চন্দ্রর মা চোখ মেলে বললে,—তোর মাকে বলিস তরু, চন্দর তোদের ওখানে আজ খাবে।

তরু হাসল,—না, চন্দরদা উপোস করে থাকবে। তুমি যে কী হয়েছ জ্যাঠাইমা, চন্দরদা খাবে এ আবার বলে পাঠাতে হবে?

চন্দ্র তরুর দিকে তাকিয়ে ছিল। তরু আরও সুন্দর হয়েছে, আরও সহজ হয়েছে! বড় বড় চোখদুটোয় চাঞ্চল্য আছে, তরঙ্গ আছে, কিন্তু কী গভীর!

তরু চন্দ্রর মায়ের শিয়রে বসে পড়ল।

—মাথাটা টিপে দোব জ্যাঠাইমা ?

নিজে ইচ্ছে করেই যেন চন্দ্রর মায়ের সেবার ভার নিলে। ভাগ্যি নিয়েছিল, নইলে যে কী হত।

দিনের পর দিন কেটে গেল। জ্বর কমে না। সরকারী ডাক্তারবাবু এলেন। ভ্রূ দুটো কুঁচকে বলে গেলেন, আর সাতদিন না গেলে কিছু বলা যায় না।

চন্দ্রর মুখখানি এ কদিনে আরও শুকিয়ে গেল। কথাটা শুনে চন্দ্র চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে টাল সামলাল। তরু দেখল চন্দ্রর মুখখানা। আস্তে আস্তে উঠে এসে ওর হাত ধরে মায়ের কাছে নিয়ে এল। শুধু কানের কাছে মুখটা এনে একবার বললে—ভয় কী চন্দরদা।

চন্দ্র পাণ্ডুর মুখে তরুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, বললে—না, ভয় আর কী!

বললে কী হবে? চন্দ্রের মায়ের অবস্থা যতই খারাপ হয়ে চলল দিনের পর দিন, চন্দ্র যেন ততই ভয়ে কাঠ হয়ে যেতে লাগল।

সমস্ত রাতটা তরু থাকতে পারে না ঠিকই। কিন্তু সন্ধ্যে থেকে অনেক রাত পর্যন্ত থাকে। সেদিন সন্ধ্যে থেকেই মায়ের সাড় পাচ্ছে না চন্দ্র। ডাক্তার এসে অবস্থা খুবই খারাপ বলে চলে গেছে। চন্দ্র ভয়ে ভয়ে তরুর কাছে এসে বসে।

তরু বাতাস করতে করতে একবার তাকায়।

চন্দ্র বলে খুব আস্তে—বড় ভয় করছে। আজ না হয় নাই গেলে!

তরু চন্দ্রের হাতটা ধরে একটু হাসে,—চিরটা কাল একই রকম। কী পুরুষ মানুষ তুমি?

চন্দ্র তবু বলে,—আজ রাতটা থাকলে হয় না? একা একা আমার রাত কী করে কাটবে?

তরু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়,—তোমার ঘরে রাত কাটানোর মানে বোঝ ?

—কেন ! মায়ের তো অসুখ !

—মায়ের অসুখটা তো পাড়াপড়শীরা শুনবে না। তারা কী ভাববে ?

—কী আবার ভাববে ? তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কী ?

চন্দ্র একটু ভেবে বলে—ভাবে তো ভাবুক।

পাখাটা বন্ধ হয়ে যায়। তরু একেবার ফিরে তাকায়। যেন একটু ব্যঙ্গ করে বলে—এত সাহস !

—তা নয় তো আবার কী ?—বলে চন্দ্র।

তরু গম্ভীর হয়ে আবার বাতাস করতে থাকে। তরু ওর দিকে তাকায় না, কথাও বলে না। আর একটু সেধে বললে হয়তো তরু থাকবে।

চন্দ্রের সত্যিই বড় ভয় ভয় করছে।

থাকবার আর প্রয়োজন হয় না। সেই রাত্রেই চন্দ্রের মা মারা গেলেন। তরু বসেই ছিল। নিঃশ্বাসটা চোখের সামনেই বন্ধ হয়ে গেল। চন্দ্র বোবার মতো বসে রইল মায়ের দিকে তাকিয়ে। একটা কথা নয়, একটু চোখের জল নয়। তরু গিয়ে খবর দিল সবাইকে। দেখতে দেখতে লোক জড়ো হল।

চন্দ্রকে সান্ত্বনা দেবার মানুষের অভাব রইল না আর। কিন্তু সান্ত্বনা দেবে কাকে ? কোনো কথা বলে না, একটু কাঁদে না। তাকে আর কী-ই বা বলা যায় ! যাঁরা সান্ত্বনা দেবার জন্য তৈরি হয়ে এসেছিলেন, বড়ই হতাশ হলেন। বরং একটু মুখ ঘুরিয়ে বললেন,—কী ছেলে রে

বাপু! সারা জীবন নিজে না খেয়ে এই ছেলেকে মানুষ করলে বুড়ী। আর একটু কাঁদলে না গা!

চন্দ্রর কানে কোনো কথাই ঢুকছিল না। মা থাকতে পারে না চিরকাল, এমন একটা ভাবনা যে তার ছিল না এমন কথা নয়। কিন্তু মা সত্যি সত্যি মরে যাবে চোখের সামনে, এ কথাটাও ঠিক ভাবতে পারত না। জীবনে ওর মা ছাড়া আর কেউই ছিল না। সেই মা মরে যাওয়ায় ও এমন একটা অবস্থায় এসে পড়ল যে সে অবস্থাকে ঠিকমত বুঝে নিতেও ওকে বেগ পেতে হচ্ছে।

কী হল! এমন হবে এও সত্যি। কিন্তু এমন হওয়া উচিত ছিল না এও সত্যি। এ রকম হলে চন্দ্রর আর রইল কী? ও নিজেকে বরাবরই এত দুর্বল বলে ভাবত, আর বোধকরি সত্যি সত্যিই এত দুর্বল ছিল যে আর-এক জনের অস্তিত্ব ছাড়া ওর নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারত না। আজ নিজের অস্তিত্বটাকে হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠা ওর পক্ষে কিছু আশ্চর্য নয়। এ ছাড়া এখন আর ওর কথা ভাববার কেউ নেই। ওর দেহ, ওর ভাবনা, ওর কাজ, সবই এখন সম্পূর্ণ ওর নিজের। কেউ দেখবার নেই, বলবার নেই। যে যা বলল ও করে চলল মুখ বুজে।

শ্মশান থেকে শুরু করে শ্রাদ্ধ অবধি একটা কথাও বলল না কারো সঙ্গে ভালো করে। শুধু টাকা দিয়ে গেল খরচের জন্যে।

তরুবালা সেই যে চলে গেল, আর আসে নি। চন্দ্র এত ভিড়ের ভেতরেও চারিদিকে কাকে যেন খুঁজেছে, কার মুখখানা দেখবার প্রত্যাশা করেছে। দেখতে পায় নি।

শ্রাদ্ধের পরদিন সন্ধ্যায় একা একা বসে ছিল ঘরে। কিছুই ভাবছিল না। শুধু বসে ছিল। চোখ দুটো ছিল ওর জানলার বাইরে। পেঁপে

গাছটার পাতা শুকিয়ে শুধু ঝরে পড়ছে। গাছটাও যেন বুড়ো হয়ে গেছে। তেমন জৌলুশ নেই আর।

তরুবালা ঘরে ঢুকল।

চন্দ্র একবার মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল।

হঠাৎ বলে ফেলল,—এ কদিন এলে না কেন?

তরু একটু অবাক হল বইকি! চন্দ্র তো এমন কথা কখনও বলে না। তরু ওর কাছে এসে বলল,—ভালো লাগে নি আসতে।

চন্দ্র সোজা হয়ে বসেছে। ওর চোখদুটো যেন জ্বলজ্বল করছে ক্রমে।

—আমার যে কী করে কেটেছে তা তো জান না?

—জানি।—বললে তরু।

—সব সময় ভেবেছি এই বুঝি তুমি এলে!

—সত্যি?—তরু একটু না হেসে পারল না।

চন্দ্র একটু কাছাকাছি এসে হঠাৎ তরুর গা ঘেঁষে বসে বললে,—অপরাধ না হয় একটা করেইছি। তাই বলে কি ক্ষমা করতে নেই।

তরু রীতিমত অবাক হচ্ছে। চন্দ্র যে এত কথা বলবে এ ওর ধারণাও ছিল না। এত কথা শিখল কোথা থেকে? কলকাতা থেকে?

—কী অপরাধ? কী বলছ চন্দরদা!

—কেন, বিয়ের আগে যা বলেছিলে!

তরু হঠাৎ খিলখিল করে হাসে,—অ! ও সব ঠাট্টার কথাও তুমি মনে রেখেছ!

—ঠাট্টা!—চন্দ্র যেন চুপসে যায়।

—তা ছাড়া আর কী! তুমিও তো ঠাট্টাই করেছিলে?

চন্দ্র ভেবেছিল, মায়ের মৃত্যুর পর যে অসহায় অবস্থায় পড়েছে ও সেই অভাবটা তরুকে আরও আপন করে নিতে পারলে হয়তো বা মিটবে

তাই একটু বেসামাল ভাবে বলে ফেলেছিল কথাগুলো। এ কথাও ওর মনে হয় নি যে মায়ের মৃত্যুর পরে বিধবা তরুর সঙ্গে এখনই এই ধরনের কথা বলা অত্যন্ত বিসদৃশ। হিসেবে গোলমাল ওর বরাবরই হয়। আজও হিসেব করে কথা কইতে পারল না। তরুবালার শেষ কথাটায় ও ঘা খেল। এই ঘায়েতে আবার নিজের স্বভাবটা ফিরে পেল। ফ্যালফ্যাল করে তাকাল একবার তরুর দিকে। ভয়ে ভয়ে।

তরু তোরঙ্গে পিঠটা টান-টান করে ঠেস দিয়ে বলে,—তারপর? এখন কী করবে?

চন্দ্র চোখ নামায়। দু-একবার নিজের মনেই কী বিড়বিড় করে! একবার মুখ তোলে। তরু মনে মনে হাসে। এই চন্দ্রদার আসল চাউনি।

একটু ভেবে, একটু থেমে বলে,—কী করব?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কী করবে?

—কী করব বলো তো?

তরুর হাসি পায়।—ওমা। আমি কী বলব।

চন্দ্রর চোখ দুটো ভারি অসহায়। বলে আস্তে,—তা আমার এখন আর—মানে—কাকে আর কী বলব। মা থাকলে কী করব বলে দিত।

তরুর বড় বড় চোখদুটোয় হাসি মিলিয়ে যায়। চন্দ্রর জন্যে মাঝে মাঝে তরু বেদনা বোধ করে। একটু একটু করে যেন কেমন একটু মমতা আসে অসহায় ছেলেটার ওপর।

—কলকাতা যাবে?

চন্দ্র বলে—তাই যাব।

—নয়ত এখানেও থাকতে পার। তবে রেঁধে দেবে কে! কাজ করবে কে?

চন্দ্র কথা বলে না।

—এখানে থাকলে একটা বিয়ে করতে হবে তোমায়।

—বিয়ে!—চন্দ্র চমকে ওঠে যেন।

তরু বলে—তবে দেখাশুনা করবে কে?

—কেন, তুমি? পারবে না?

—তোমার মাথায় কিছু নেই। আমি তোমার কে যে তোমার দেখাশুনা করতে যাব?

চন্দ্র মুখটা নীচু করে। তাও তো বটে! আবার একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে। আস্তে আস্তে মুখ তুলে বলে,—তবে কলকাতাতেই যাই।

—তাই যাও।

চন্দ্র বলে—তাহলে জমিজমা সব বিক্রি করেই যাই।

—যা ভালো বোঝ। তরু বলে—কলকাতায় যদি কখনও যাই, দুদিন খেতে দেবে তো?

চন্দ্রর মুখটা উজ্জ্বল হয়,—সত্যি তুমি যাবে?

—যদি যাই।—তরুবালা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হঠাৎ যেন কী ভাবতে থাকে। চন্দ্র তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। চন্দ্রর চোখ পড়তেই তরুবালা একটু সলজ্জ হেসে বলে,—মানে, যদি কখনও যাই। যেতেও তো পারি।

—গেলে আমায় জানিও। আমার ঠিকানা রেখে যাব।

—তখন কি আর দেখা করবে? হয়তো ঘেন্না করবে।

—ঘেন্না করব কেন?—অবাক হয়ে যায় চন্দ্র।

তরু কথাটা সামলাতে বলে—না। এমনি বললুম। কলকাতায় গিয়ে কী করবে বলো তো?

চন্দ্র ভাবে। চুপ করে থাকে।

—তোমার ওই হোমিওপ্যাথি কি কলকাতায় চলবে? যা সব শুনি কলকাতার কথা!

—কী শোন?

—শুনি।

—কার কাছে?

—একজনের কাছে।

চন্দ্রর অবাক হবার কথা।—একজন কে?

তরু যেন একটু বিরক্ত হয়।—সে আছে। আচ্ছা যাই।

বলে নড়েচড়ে দাঁড়ায়। চন্দ্র আর কথা বলে না।

তরুই বলে—যাবার আগে জানিও।

চন্দ্র ঘাড় নাড়ে। কথা বলে না আর।

পাঁচ

চিঠিটার কথা আজও চাটুজ্যের মনে আছে। কথাগুলো পরিষ্কার মনে আছে। চিঠিটা পেয়েছিলেন মেসেই। তার পরের বছরেই এই বাড়িতে চাকরি পেয়ে চলে এলেন। জীবনে এই আর-একবার কেঁদেছিলেন চাটুজ্যে। ওই চিঠি পেয়ে চোখের জল রাখতে পারেন নি। কারণটা ঠিক বেদনা নয়, জ্বালা নয়। কী যে কারণ তা কখনও বুঝতেই পারেন নি।

সামনের প্রাসাদের ওপারে চাঁদ নেমে গেছে। ঘরটা বেশ অন্ধকার। রাত কত হবে কে জানে। চাটুজ্যে ঝিমোতে ঝিমোতে একবার সামনের দিকে তাকান। কাশির বেগটা আজ রাত্রে অনেক কম! কিন্তু শরীরটা বড় অবসন্ন লাগে। মাথা সোজা করে তাকিয়ে থাকতেই কষ্ট হয় যেন। অনেক রাত এমনি ঠায় বসে বসে কাটিয়ে স্নায়ুগুলোর শক্তি কমে এসেছে। ইচ্ছে করে যে কিছু চিন্তা করতে পারছেন তা নয়। আপনাআপনি কতকগুলো ভাবনা এসে যাচ্ছে মাথায়। একটার পর একটা ভাবনা ঠিক ঠিক পর পর আসছে, যেন সাজানো ছিল বহুকাল মনের ভাঁজে ভাঁজে।

চিঠি পেয়েছিল চন্দ্র প্রায় পাঁচ বছর পরে। কলকাতায় চলে এসে তরুর স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে আসছিল ক্রমে। হোমিওপ্যাথি পড়াও আর এগুল না। অসুস্থ হয়ে পড়ল চন্দ্র।

শরীরটাকে জোড়াতালি দিয়ে ঠিকঠাক করতে কেটে গেল দুটো

বছর। জমিজমা বিক্রি করে টাকা যা ছিল তাইতেই চলল কোনমতে। তরুবালার কথা যে মাঝে মাঝে মনে হত না, এমন নয়। মনে হলে শুধু ভাবতেই ভালো লাগত। কোনো সময়ও আর গ্রামে ফিরে যাবার কথা মনে হত না। নিরাসক্ত নিষ্কর্মা হয়ে কাটাতে বেশ ভালো লাগত ওর। চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়েই সময় কাটত ওর বেশি। এই কি দিন কাটানো? এই কি জীবন? মাঝে মাঝে এ প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে নিজের মনেই ঘেমে উঠত চন্দ্র। কিন্তু এ ছাড়া কী বা করতে পারে ও? সংসারে সকলের জন্য সব কাজ নয়। এ কথা ও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। ডাক্তারিতে কনস্টিটিউশনে 'অ্যালার্জি' কথাটা ভেবেই সান্ত্বনা। সকলের শরীর সমান নয়। মনও সকলের সমান নয়। সবাই যে কেবল একই রকম কাজ করবে এমন কথাও কিছু নয়।

দিন কেটে চলছিল ঠিকই। দেখতে দেখতে পাঁচটা মস্ত বছর কেটে গেল। পাঁচ-পাঁচটা বছর, অথচ মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। সময় কত তাড়াতাড়ি কাটে! ধরে রাখতে চেষ্টা করলেও ধরে রাখা যায় না। আশ্চর্যভাবে একটার পর একটা দিন কাটে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। চুপ করে বসে ভাবলে চমকে উঠতে হয়।

চিঠিখানা যেদিন পেল, সেদিন চমকেই উঠল চন্দ্র। পাঁচটা বছর কেটে গেছে। বেলা দশটা নাগাদ চিঠিটা এল। মেস তখন প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে। চন্দ্র বসে আছে। ওর তাড়া নেই। তাগাদা নেই। দিনগুলো এমনিই যায়, তাকে তাড়া করে তাড়িয়ে আর কী লাভ!

চিঠিটা পেয়ে প্রথমে ঠিক বুঝতে পারে নি কার চিঠি। এই পাঁচ

বছরে একখানা চিঠিও ওর নামে আসে নি। চিঠি দেবার মানুষ যিনি ছিলেন, তিনি নেই।

পাঁচ বছর বাদে চিঠি কে দিল? ওপরে এসে চৌকির ওপর বসল চন্দ্র। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ওর চৌকিতে; বালিশের ওপর। একটু একটু শীত করছে। রোদটা বেশ মিষ্টি লাগে। রোদে পিঠখানা দিয়ে বসল চন্দ্র হাঁটু দুটো বগলে রেখে।

চিঠিটা খুলে অবাক হল। তরুর চিঠি। খুব অবাকই বা কী! আস্তে আস্তে পড়তে লাগল চন্দ্র। চিঠিখানা লিখেছে নিশ্চয়ই অনেক ভেবে, অনেক সময় নিয়ে—

চন্দ্রদাদা!

সম্বোধনে আর কিছুই নেই! লেখাটা আঁকাবাঁকা।

এতদিন পরে কেন যে তোমাকে পত্র লিখিতে বসিলাম তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবা।

চিঠির এখানটায় একটু জল পড়ে কালিটা ধুয়ে গেছে। কিসের জল? চোখের?

আজ ভীষণ বিপদে তুমি ছাড়া আর কাহারও কথা মনে পড়িল না।

অনেক বানান ভুল। চন্দ্র পড়ে যায়।

তুমি কলিকাতায় চলিয়া যাইবার পর আমি গেরাম হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। রানাঘাটে আসিয়াছিলাম নায়েব মশাইয়ের ছেলে মোনাদাদার সহিত।

থমকে যায় চন্দ্র। তরুবালা গৃহত্যাগ করেছে। বিধবা তরুবালা। রূপসী, পূর্ণযৌবনা। তবু গৃহত্যাগ? মোনার সঙ্গে?

মোনাকে চন্দ্র চেনে। নায়েব মশায়ের ছেলে। দুবার ম্যাট্রিক ফেল করে টিটাগড়ে বোধহয় একটা কারখানায় কাজ করেছিল কিছুদিন।

লম্বা-চওড়া কালো ছেলেটি। দেখলে ভয় করে, ঘৃণাও হয়। ঠোঁঠ দুটো মোটা। নাকটাও খুব মোটা। হাতের কব্জি যেন ষাঁড়ের মতো। সেই মোনার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তরুবালা রানাঘাটে।

চুপ করে বসে থাকে চন্দ্র। রোদ্দুরে পিঠটা জ্বালা করছে। একটু ঘুরে বসে।

পড়তে থাকে আবার—

যে ভুল করিয়াছিলাম তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক, মোনাদাদা পলাইয়াছে। আমার সর্বনাশ করিয়া পলাইয়াছে। রানাঘাটে চার বছর আছি। তোমাকে খবর দিই নাই। আজ আর না লিখিয়া পারিলাম না। তুমি ছাড়া আর ক্ষমা কে করিবে। পত্রপাঠ একবার আসিও। না আসিলে জানিবা আমার মৃত্যু হইবে। ইতি—হতভাগিনী তরুবালা।

রোদ এসে পড়েছে আবার পিঠে। পিঠখানা পুড়ে গেল যেন। তবু একভাবেই বসে আছে চন্দ্র। একটুও নড়তে পারছে না। চোখ দুটো ওর জলে ভরে গেছে।

কেন? বেদনায়, না ঘৃণায়?

কে জানে। চোখ দুটো মুছে উঠে পড়ে চন্দ্র। জামাটা গায়ে দেয় ধীরে ধীরে। ছোট বাক্সটা থেকে টাকা বের করে পকেটে নেয়। জুতো পরে ঘর থেকে বেরোয়।

মেসের ঠাকুরকে বলে,—আসতে আমার রাত হবে। এবেলা খাব না।

হঠাৎ দুপুরে বাবুকে বেরোতে দেখে ঠাকুর একটু অবাক হলেও বলে না কিছু।

সোজা শিয়ালদহে এসে পড়ে চন্দ্র।

কিছু পরেই ট্রেন একটা ছিল। রানাঘাটের টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসে। এক কোণে বসে থাকে চুপ করে। ভয় করে না। আনন্দও হয় না খুব একটা। বরং একটু আতঙ্কের ভাব দেখা যায় ওর মনে।

না আসিলে আমার মৃত্যু হইবে—লিখেছে। শেষকালে মরবে-টরবে নাকি কে বলতে পারে। এমন সব ব্যাপারে এমন একটা কিছু হয়েও যায়।

চিঠিটা কবে লিখেছে তরুবালা? তারিখ কিছু নেই। কে জানে? চিঠিটা যদি দশদিন আগে লিখে থাকে? এ দশদিন যদি তার জন্যে অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে গিয়ে থাকে তরুবালা?

কী বিশ্রী ভাবনাগুলো। অথচ এ ভাবনা মন থেকে যায় না।

শীতের দুপুরে রোদ বড় চনচনে। স্টেশনে নেমে চন্দ্র স্ট্র্যাণ্ড রোডে যেতে বলে ঘোড়ার গাড়িওলাকে। ঘোড়ার গাড়ি করে চলে। স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে যেতে যেতে চোখে পড়ে চূর্ণী নদী। নদীটির গড়ন খুব ফাঁপালো নয়। একটু বরং রোগা, তন্বী। বিশেষ করে শীতের সময়।

জিজ্ঞেস করতে করতে ঠিক বাড়িটার সামনে এসে নামে। বেলা তখন ঠিক দুপুর। এধার ওধার নির্জন। বাড়িটা ছোট। ওপরে টালি। ইটের দেয়াল। দরজায় ঘা দেয় চন্দ্র আস্তে।

—কে?

তরুবালার গলা। কোনো ভুল নেই।

—আমি। দোর খোলো।

দরজাটা খুলে যায়। সামনে একটি মহিলা। তরুবালা নয় তো! চন্দ্রর বুকের ওঠানামার শব্দ শুনতে পায় ও নিজেই।

—তরুবালা থাকেন এখানে?

—থাকেন। কোত্থেকে আসছেন?

—বলো চন্দরবাবু এসেছেন।—একটু আশ্বস্ত হয় চন্দ্র।

মেয়েলোকটি ভেতরে যায় একটু। পরে এসে বলে,—আস্থন।

ভেতরে ঢোকে চন্দ্র। সামনে ঘরটায় চোখ বোলায়। একটা ন্যাড়া চৌকি পাতা। আর কিছু নেই। সামনে সরু এক ফালি বারান্দা। বারান্দাটা ঘেরা। ওপরের লোহার জালের ভেতর দিয়ে চোখে পড়ে চুর্ণী নদীর ক্ষীণস্রোত। ওপারে গাছগাছালি। এপারে কাদাভরা ঘাট। তবু বড় মিষ্টি। নির্জন দুপুরে হঠাৎ বড় মিষ্টি লাগে চন্দ্রর।

—এদিক পানে আস্থন বাবু।

ডানদিকের ছোট ঘরটায় ঢোকে চন্দ্র। এ ঘরেও একটি চৌকি। টুকিটাকি জিনিস এধারে ওধারে। চৌকির ওপর একখানা কম্বল গায়ে শুয়ে আছে তরুবালা। বড় বড় চোখ দুটো তুলে তাকায়। মুখখানা পাণ্ডুর সাদা। অনেক রোগা হয়ে গেছে যেন।

একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্র। এগোবে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তরুবালার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুহূর্তের জন্যে।

ম্লান হেসে বলে,—এসো।

তরু আস্তে আস্তে উঠে বসে চৌকির ওপর। কম্বলটা পায়ের ওপর থাকে।

চন্দ্র চুপচাপ গিয়ে বসে চৌকির ওপর এককোণে।

তরুবালা চোখ নীচু করে ছিল এতক্ষণ। চোখ তুলে তাকায় আবার। চন্দ্র দেখতে পায় ওর চোখদুটো জোলো। ভিজে উঠেছে বড় বড় চোখের পাতা। চন্দ্র কী বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। এত ভাবনা চিন্তা। তরুবালার সামনে এলে সব যেন কেমন গুলিয়ে যায়।

একটা ঢোঁক গিলে বলে,—কেমন আছ ?

তরুবালার গালের ওপর টপটপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে।

চন্দ্র অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে।

—চিঠি পেয়েছিলে ?

চন্দ্র ঘাড় নেড়ে জানায়।

মেয়েলোকটি ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। তরুবালা চন্দ্রর চোখের আড়াল করে চোখ দুটোর জল মোছে। চোখের কোণদুটি আরক্তিম।

সহজ ভাবে বলতে গিয়েও খুব সহজ হতে পারে না।—চিঠিটা পড়ে কী ভাবলে ?

চন্দ্র তাকায়। যেন কথাটা ঠিক বোঝে নি ও।

—খুব ঘেন্না হল, নয় ?

ঘৃণা! চন্দ্র একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

তরুবালা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বলে—আমিও তাই ভাবি। মরে গেলুম না কেন। নিজের ওপর নিজেরই ঘেন্না হয়।

চন্দ্র কী আর বলবে। তরুর সামনে ও কখনই খুব বেশি কথা বলতে পারে না।

—তবু তুমি এলে!—বলতে বলতে আবার চোখ দুটো ওর ভিজে ওঠে।

চন্দ্র এবার অনেক চেষ্টা করে বলে—কী অসুখ ?

—অসুখ ?—মুখটা নীচু করে বসে থাকে তরু। কী বলবে ও!

—শরীর তো খুব কাহিল দেখছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তরু একটু ম্লান হেসে বলে—অসুখ কিছু নয়। দিন দশেক আগে কী যে হয়ে গেল।

—কী হল ?

তরুবালার মুখটা সাদা হয়ে যায়।

চন্দ্র কথা পালটায়,—ডাক্তার দেখছে ?

মাথা নাড়ে তরুবালা,—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, ওই মেয়েলোকটি কে ?

—ঝি। শুধু ঝি নয়। ও আমাকে নিজের মেয়ের মতো ভালো-বাসে। ও না থাকলে এবার বাঁচতুম না।

চন্দ্র বলে—রানাঘাটের চেয়ে কলকাতায় গেলেই পারতে ?

—কখন ?

চন্দ্র কথাটা বলতে একটু ইতস্তত করে। তবু বলে,—ওই ইয়ের সঙ্গে যখন চলে এলে।

তরু চন্দ্রর চিরকেলে ভাবটা দেখে হাসে,—মোনাদার সঙ্গে ? কী যে বল! কলকাতায় গেলে চেনা-জানা লোকের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা রয়েছে যে। এটুকু বোঝ না ? পালিয়ে এলাম। পালিয়েই বেড়াতে হবে, না ? তারপর একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—বোধ হয় আজীবন।

—মোনা কবে গেল ?

—মাসখানেক হবে।

—দেশে তো মোনার কথা আমায় কখনও বল নি ?

চন্দ্রর বোকার মতো প্রশ্নে আবার হাসে তরু,—সব কথা তোমায় বলতে হবে ?

—তা হবে না ?—চন্দ্রর সহজ জবাব।

তরু কিছুক্ষণ চুপ করে চন্দ্রের দিকে তাকায়। তারপর মাথাটা নীচু করে আস্তে আস্তে বলে—তোমাকে না বলে অন্যায় করেছি।

সহজ স্বীকারোক্তি।

চন্দ্র জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। বেলা পড়ে আসছে। খিদেটা মরে গেছে ওর। শরীরের ভেতরটা যেন টানছে। কান দুটো গরম লাগছে।

তরুবালা বলে—বললে কী করতে?

—চলে আসতে বারণ করতুম।

—আমি যদি না শুনতুম?

—কেন শুনতে না?

তরুবালা মুখটা নীচু করেই বলেছে—কেন শুনতুম না? কী আর বোঝাই তোমাকে। এই দেহটায় একটা ভূত চেপেছিল। সে ভূতের খিদে মেটাবার জন্যে তখন বোধহয় সবকিছুই করতে পারতুম। সে ভূতের যে কী জ্বালা তুমি কখনও জানলে না। তাই তো এত ভূতের কাণ্ড বাধল।

চন্দ্র চুপ করে আকাশের দিকে তাকায় জানালা দিয়ে।

—কী ভাবছ?

চন্দ্র তরুর দিকে তাকায়। এতক্ষণে একটু হাসতে পারে। বলে,—তুমিও ভূতের ভয় কর?

তরু হঠাৎ জবাব দিতে পারে না। চন্দ্রর মুখে কথাটা ওর ভারী ভালো লাগে।

—মোনার কোনো দোষ নেই।—বলে চন্দ্র।

তরু গম্ভীর মুখে বলে—না, ওর কী দোষ! দোষ সব আমার।

—তোমারও দোষ কিছু দেখছি নে আমি।

তরু অবাক হয়ে চন্দ্রর দিকে তাকায়। এত সহজে ও এমন কথা কী করে বললে!

চন্দ্র আবার বলে—তুমি তো কোনো দোষ কর নি

—দোষ করি নি ?

—না।

—বিধবা হয়ে একজন পুরুষের—

—ও সব কী জান, মানে—তুমি কি আর ইচ্ছে করে কিছু করেছ ?

—তবে ?—তরুবালা অবাক। চন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে।

চন্দ্র তেমনি সহজ ভাবেই বলে—তুমি তো খারাপ নও।

—কিন্তু কী বলছ তুমি! আমি খারাপ নই! দশদিন আগে যে একটা সন্তান নষ্ট হয়ে গেল।

চন্দ্র একটুও চমকায় না। জিজ্ঞাসা করে—কার ?

—মোনাদার।—মুখটা নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়েছে তরুবালার। যেন মাটিতে মিশে যেতে চাইছে।

চন্দ্রর ভ্রূ দুটো একটু কুঁচকে ওঠে। তরুবালার শরীর কেন এত খারাপ, বুঝতে পারে। ওর পাণ্ডুর মুখখানার দিকে তাকিয়ে চন্দ্রর বুকের ভেতরটায় এক আশ্চর্য অনুভূতি আসে। তরুবালা মা হয়েছিল। মা হতে চেয়েছিল।

—তুমি খারাপ নও।

তরুবালার চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে আবার।

চন্দ্র একটু থেমে আবার বলে—তোমার আর কী দোষ!

তরুবালা চোখ দুটো মোছে এবার। মুখটা তুলে রুক্ষ চুলের দু-একটি ছোট ছোট গুচ্ছ কপাল থেকে সরায়। আর ভয় নেই ওর। ভাবনা নেই। ও জেনেছে সংসারে অন্তত একটা মানুষ আছে যে ওকে ঘৃণা করে না। যে ওকে পুরোপুরি ক্ষমা করতে পেরেছে।

চন্দ্র যে আজ তরুর কাছে কত বড় হয়ে গেল, তা বোধহয় চন্দ্র নিজেও জানে না। চন্দ্রর ওই রুগ্ন মুখখানা আর ওই ধীর শান্ত কথা কটি তরুর জীবনের অনেক ভয়, অনেক আক্ষেপকে মুছে দিল। তরুবালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আবার। ও অনেক সহজ হয়ে আসছে। পঙ্গু মনের কালি ধুয়ে গেল অনেকটা। আজ। একটু আগে।

ও সোজা হয়ে বসতে পারল। হাসতে পারল। বলতে পারল—তুমি ভাত খেয়ে বেরিয়েছিলে?

চন্দ্র বলে,—না।

—ছি ছি। এতক্ষণ কিছু বল নি? না খেয়ে বসে আছ?

তরুবালা উঠতে যায়।

চন্দ্র বারণ করে না। দেখে বসে বসে।

—স্নান করবে? নদীতে? অ কনক!

কনক ঝিয়ের নাম। তরুবালা আস্তে আস্তে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

চন্দ্র আস্তে আস্তে ওঠে।

জানলার ধারে যায়। বারান্দার ওধারে চোখে পড়ে চূর্ণী নদীর ক্ষীণ স্রোত। ওপারে দু-তিনটে ধবধবে সাদা গোরু আর একটা বাছুর। পড়ন্ত বেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী শান্ত আর কী ধীর ওদের নড়াচড়া। অনেক আকাশ। অনেক মাঠ। অনেক সময়।

পরম প্রাণারামে চোখও যেন ওদের আধবোজা। জাবর কাটছে তো কাটছেই! চন্দ্রর মাথাটা ধরেছিল। নদীর ঝিরঝিরে বাতাস আসছে। বেশ ভালো লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে চোখ দুটো বুজে অনেকক্ষণ বসে থাকে চুপ করে। নদীর কোনো এক কিনারায় গিয়ে। একা একা।

—এই নিন বাবু। গামছা।

চন্দ্র ফিরে তাকায়। বলে—এই অবেলায় স্নান করব না।

কনক ঝি বলে—তবে হাতমুখ ধুয়ে নিন।

চলে যায় ও।

চন্দ্রও গামছাটা কাঁধে ফেলে নদীর ধারে যাবার জন্যে ঘর থেকে বেরোয়। বাইরের ঘরটায় এসে দেখে তরু চৌকির তলা থেকে একটা বাক্স বার করছে। চন্দ্র একটু দাঁড়ায়। তরু বাক্স থেকে একখানা ধুতি বার করে। চন্দ্র লক্ষ্য করে চৌকির তলায় একটা হারমোনি-য়ামের বাক্স আর তবলা।

ঘরের ভেতর ঢুকে সদর খোলে ও:

—কোথা চললে?

—নদীতে। ঘাটে।

—থাক, আর ঘাটে যেতে হবে না। কনক জল এনে দেবে। বাড়িতেই চান করো।

—না থাক, আমি আসছি এখুনি।

চন্দ্র বেরিয়ে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ দিকে একটু দূরে চলে যায়। নদীর এই ক্ষীণ রূপটি ওর বড় ভালো লাগছে। কলরব নেই। তরঙ্গ নেই। নিস্তরঙ্গ ঘোলা জল। স্রোতের টানটা বোঝাই যায় না ভালো করে। ওর নিজের দেহটার সঙ্গে নদীটির যেন কেমন মিল খুঁজে পায়। চন্দ্রর ভেতরেও উজান-ভাঁটার টান থাকলে বড় বোঝা যায় না। ওর মনটা চূর্ণীর স্রোতের মতো।

বৈকালী সূর্যের মিঠে রোদটুকু কোথাও আটকে যায় নি কোনো অট্টালিকার চূড়ায়। কলকাতার মতো। ঢালাও রোদ। অঢেল অজস্র।

একটা ঘাটের কাছে এসে নামে চন্দ্র। মুখে চোখে জল ছিটিয়ে দেয়। কী শীতল স্পর্শ। অনেকটা জলে ভিজিয়ে নেয় মুখ হাত পা। ভিজেই থাক। মোছবার দরকার নেই।

এমনি এমনি দাঁড়িয়ে থাকা, তাকিয়ে থাকা ওর স্বভাব। ফিরতে দেরি হয়ে যায় অনেকটা।

সূর্য তখন অনেক নেমে এসেছে। ফিরে এসে একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে। দোরটা বন্ধ ঠিকই। কিন্তু জানলা খোলা, আর জানলায় বসে আছে তরু। ভেতরে আসতেই তরুর একটু রাগ-রাগ গলা কানে আসে।

—সব সমান। সেই কখন বেরিয়ে গেছ। হাত মুখ ধুতে বেলা কাবার!

চন্দ্র লজ্জিত হয়েই বলে—একটু ঘুরেফিরে এলুম।

—বলে গেলেই হত।

চন্দ্র চুপ করে থাকে।

—বোসো।

ঘরের মেঝেতে আসন পাতা। সামনে খাবার। চন্দ্র নীরবেই বসে পড়ে। তরু চৌকি থেকে নেমে এসে সামনে বসে।

একটু লজ্জিত হয়েই যেন বলে,—কী করব বলো। দোকানের খাবার। তবু আসবার পরেই যদি বলতে, কিছু রাঁধবার ব্যবস্থা করা যেত।

চন্দ্র খেতে খেতে বলে—কে রাঁধে?

—কনক। আমার তো এখন—

কচুরি, তরকারি, মিষ্টি। একটু বেশিই মনে হয় চন্দ্রর। তবু ফেলতে সঙ্কোচ বোধ করছিল।

তরুই বললে—থাক, অবেলায় ওগুলো আর বেশি খেও না। সন্ধ্যের পর রান্না করে দোব, খেও।

বেঁচে গেল চন্দ্র।

সন্ধ্যের আর বে.শ দেরি নেই। তরু উঠে একটু ঘোরাফেরা করছিল। চন্দ্র কাত হয়ে বসে ছিল তরুর বিছানায়। দেখছিল তরু অনেক সহজ হয়ে আসছে ক্রমে। অতি অল্প সময়ে। মেয়েদের স্বভাবই বোধহয় এমনি। এত অল্প সময়ে মিশিয়ে নিতে পারে।

তরু এসে এক সময় চৌকির ওপর বসে পড়ে,—উঃ! বাবা! হাঁফ ধরে গেছে। এ কদিন উঠি নি তো। আজই বিছানা থেকে উঠলুম। কী ভাবছ?

চন্দ্র চুপ করে আছে।

—কী, আজ যাবে ভাবছ নাকি? তা যেতে অবিশ্যি পার। খেয়ে-দেয়ে যেতে কষ্ট হবে। তার চেয়ে কাল না হয় যেও।

চন্দ্র ও কথার উত্তর না দিয়ে বলে,—কিন্তু কী জন্যে ডেকেছিলে তা তো এখনও বললে না?

তরু চুপ করে থাকে।

একটু সময় ভেবে বলে,—। কী জন্যে? ঠিক কিছুর জন্যে নয়। তুমি আসবে, শুধু এই জন্যেই। তা ছাড়া আর কিছু তো মনে পড়ে না।

চন্দ্র একটু অবাক হয়।

—হ্যাঁ, এই জন্যেই। মোনাদা যখন চলে গেল, যেন অগাধ জলে পড়লুম। এ কদিন ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে পারি নি। বিশ্বাস করো, ভয়ে ঘুম হয় নি একদিনও।

একটু ভাবে তরু,—কী জান? ঠিক বোঝাতে পারছি নে।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম আপন বলে আর কেউ নেই। তাই তোমার কথা মনে হল। তোমাকে লিখলুম।

চন্দ্র চুপ করে রইল।

—আর ভয় করি নে।—একটা নিঃশ্বাস ফেলে তরু।—তুমি কী ভেবেছিলে আমি জানি।

—কী ?

—তুমি ভেবেছিলে আমি খেতে না পেয়ে তোমায় লিখেছি। তা নয়। মোনাদা টাকা যা রেখে গেছে, তাতে বেশ কিছুদিন চলবে। জান তো, নায়েব মশায়ের একমাত্র ছেলে! প্রায় হাজার ছয়েক টাকা নিয়ে এসেছিল। তা ছাড়া রোজগারও করত।

—কী করত ?

—কী করত সেটা ঠিক জানি নে। রোজ রাত্রে মদ খেয়ে ফিরত। পকেটে কয়েক শ টাকা থাকত প্রায়ই। কী করে পেত কে জানে!

তরু গম্ভীর হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে বলে—ভাবছি, ওর টাকা আমি নেব না। এ ক বছর আমি গান শিখেছি।

চন্দ্রর মনে পড়ল চৌকির নীচে দেখেছে হারমোনিয়াম, তবলা।

—গান বেশ ভালো যখন শিখতে পেরেছি। শরীরটা একটু সামলে এখানে ওর টাকা খরচ করে একটা স্কুল করব। সেখানে গান শেখাব। যা মাইনে পাব আমার তাতে চলে যাবে। তুমি কী বল ?

—মন্দ নয়।—চন্দ্র তাকিয়ে থাকে তরুর দিকে।

তরুবালা তন্ময় হয়ে গিয়েছিল নিজের ভাবনায়,—বেশ হবে। অনেক ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে দিনগুলো কাটবে ভালোই। তা ছাড়া তুমি আছ। তুমি তো কখনও ফেলবে না ?

চন্দ্র ভাবল, তুললুম কখন যে ফেলব। তোলাও হল না, ফেলাও হল না। শুধু দেখা।

—যদি রাগ না কর একটা কথা বলব?

তরুবালার এমন অনুনয় বিনয় ভালো লাগে চন্দ্রর। তরুর সবটুকুই জোর করে পাওয়া। জোর করতেই ও চিরকাল জানে।

—কী?

—কদিন থাকবে এখানে। তারপর চলে যেও। সপ্তাহে দু-একবার এসো। দু-একদিন থেকো। আর কিছু চাই না।

চন্দ্র চুপ করে থাকে।

—কথাটার অন্য মানে কোরো না।

চন্দ্র বলে—তুমি যা বলবে, তাই হবে! অন্যরকম তো কখনও হয় নি।

চন্দ্রর হাত দুখানা ধরে ফেলে তরুবালা—বাঁচালে।

তরুবালার হাত দুখানা ঠাণ্ডা। শীতল স্পর্শ চূর্ণী নদীর জলের মত। বছর পাঁচেক আগে এই হাতের স্পর্শ ছিল আগুনের মতো গরম।

—এইটুকুতেই বেঁচে গেলে!—চন্দ্র না বলে পারে না।

তরু হাত ছেড়ে দেয়। মুখটা নীচু করে বলে—তুমি কী বুঝবে। তুমি তো মেয়েমানুষ নও।

কথাটা বোধহয় সত্যি। চন্দ্র তরুর জন্যে বেদনা বোধ করে। কথাটা না বললেই হত।

তরুবালা উঠে পড়ে—দেখি কনক কী রাঁধছে।—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। চন্দ্র যেমন বসে ছিল, তেমনি বসে থাকে।

শোনা যায় চূর্ণী নদীর জলে ছপছপ বৈঠার আওয়াজ।

ছয়

চাটুজ্যে মাথাটা ওঠান হাঁটুর মাঝ থেকে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। তারাগুলো ফিকে হয়ে এসেছে। আকাশের রঙ ইস্পাতের মতো। গাঢ় নীল। দু-চার টুকরো সাদা মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে এধারে ওধারে। বাতাসটা বড় ঠাণ্ডা। হাড়ে এসে বেঁধে বাতাসের ঝাপটা। শিরশির করছে শরীরটা। কাশির বেগে চাটুজ্যে কেঁপে উঠলেন বেতের মতো। দুবার দুলে উঠলেন। পড়ে যেতে যেতে অতি কষ্টে সামলালেন। আবার মাথাটা ঝুঁকে পড়ল হাঁটুর মাঝখানে। আবার অবসাদ। সামান্য ঝাঁকুনির পরই নেতিয়ে পড়া।

এক-এক ফোঁটা গলা সীসের মতো বিন্দু বিন্দু সময় ঝরে। চাটুজ্যের মাথায় আকাশ-পাতাল ভাবনা ভিড় করে। কোথাকার ভাবনা? অন্তহীন এক ক্ষীণ সুতোর মত ঘটনার পর ঘটনা। কথার পর কথা।

তরুবালা তো রয়েছে। আজও রয়েছে সেই বাড়িতে। কিন্তু আজকের তরুবালা কি সেই তরুবালা? কিছু কি পরিবর্তন হয় নি? ওর সবকিছু পরিবর্তনের একমাত্র সাক্ষী চাটুজ্যে। সাক্ষীই বটে। শুধু দেখেই গেছে। প্রশ্ন করে নি। কখনও বা করলেও জবাব আশা করে নি। আশ্চর্য এই যে প্রশ্নের আগেই জবাব এসে গেছে।

তরুবালার চিরদিনের স্বভাব। জবাব দেয়া। জীবনে ও অনেক জবাব দিয়েছে। অনেককে জবাব দিয়েছে। ওর জীবনে রয়ে গেছে শুধু চাটুজ্যে। আজও? হ্যাঁ। হয়তো আজও।

নীরেনবাবু জুটেছেন ইদানীং। কবে তাঁর মেয়াদ শেষ হবে কে জানে। নীরেনবাবুর চেহারাটা মনে পড়তেই আবার কাশির বেগ আসে। আশ্চর্য মানুষ এই নীরেনবাবু। এমন করিতকর্মা মানুষ বড় একটা চোখেই পড়ে নি চাটুজ্যের।

বাঁদিকে বললে যাবেন ডানদিকে। পূর্বে বললে পশ্চিমে। সেটা কখনই ঠিক বলে নিজের মনে বিশ্বাস করবেন না, যেটা বলবেন। আর যেটা বলবেন না, সেইটাই ঠিক ভেবে নেবেন।

নিজে মিঠে মিঠে হেসে পরকে কাঁদাতে এমন চতুর মানুষ সচরাচর চোখেই পড়ে না। এক-এক সময় মনে হয় চাটুজ্যের; প্রতিষ্ঠা আর অর্থের জন্যে যে কটি গুণের প্রয়োজন সব কটিই নীরেনবাবুর আছে।

চাটুজ্যের ভাবনা একের পর এক পার হয়ে যায় রেল ইঞ্জিনের এক-এক স্টেশন পার হবার মতো। এক-একটি স্টেশন যেন এক-একটি ঘটনা, যেখানে থেমে আবার অন্য ঘটনায় যেতে হয়।

সেদিন চলে আসবার পর থেকে নিয়মিত তরুবালার কাছে যেতেন চাটুজ্যে। প্রতি শনিবার যেতেন। ফিরতেন রবিবার।

পরের শনিবার দুপুর বেলা যখন তরুবালার কাছে এলো তখন তরুবালা অন্য মানুষ।

বাড়ির সামনে এসে দরজায় হাত দেবার আগেই শুনতে পেলো।

—দাঁড়াও আসছি।

চোখ ফিরিয়ে দেখল তরুবালা জানালার ধারে বসে আছে। বললে, —দাঁড়াও।

নিজেই এসে দোর খুলে দিল।

ঘরে ঢুকল চন্দ্র। তাকাল ওর দিকে। কয়েকদিনের ভেতর তরু-বালা অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চোখে মুখে বেশ একটা দীপ্তি।

—ট্রেন বুঝি দেরিতে এল ?

চন্দ্র অবাক হয়।—না তো ?

—জানলায় বসে বসে কোমর ব্যথা হয়ে গেল।—বলতে বলতে তরুবালা থেমে যায়।

হয়তো ভাবে, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে নাকি !

চন্দ্রের মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই ।

বলে,—কী করে জানলে এই সময় আসব ?

—আগের বারও তো এই সময়ে এসেছিলে।

—তবু যদি না আসতাম ?

—বসে থাকতুম।—বলেই তরুলতা কথাটা ঘোরায়।—ভেবেছ তোমার জন্যে বসে থাকতুম ? কখনো নয়। কনককে সঙ্গে নিয়ে নদীর ঘাটের পাড়ে গিয়ে বসে থাকতুম।

চন্দ্র উত্তর দেয় না।

তরুবালা ছোট বারান্দায় গিয়ে ডাকে,—মুখ হাত পা ধুয়ে নাও।

চন্দ্র জামা খোলে। বারান্দার দিকে এগোয়।

বালতির জলে হাত মুখ ধুতে ধুতে তাকায় তরুর দিকে।

হঠাৎ বলে,—এখন কেমন আছ ?

তরুবালা ওর বোকার মতো প্রশ্ন শুনে বহুকাল অভ্যস্ত। মুখ টিপে হেসে বলে,—কেমন দেখছ ?

চন্দ্র তাকায়,—ভালোই।

—তবে ভালোই। কী খাবে এখন তাই বলো ?

—যা হোক কিছু—।

—চাট্টি মুড়ি আর গুড় দিই।

—মুড়ি গুড়! আচ্ছা, দাও।

—ঘরে গিয়ে বোসো। কনক এখনি এসে পড়বে। মুড়ি আনতে হবে তো।

চন্দ্র কথা না বলে ঘরের ভেতরে ঢোকে।

ভেতরে বসবার জায়গা না পেয়ে তরুবালার বিছানার ওপরই বসে।

মনটা ওর আজ একটু ভালো লাগছে। অনেক সহজ হয়ে এসেছে তরুবালা। আগের মতোই চঞ্চল হয়ে উঠছে। তরুবালার এই চাঞ্চল্যটাকে ও ভয়ও করে। ওইটেই জীবনে ওকে এক জায়গায় থাকতে দেয় না। এক রকম থাকতে দেয় না।

তবু তরুবালা একটু না বকলে না চেঁচালে না জোর করলে ওর অস্তিত্বই যেন পাওয়া যায় না। ওর রূপের সঙ্গে ওর চাঞ্চল্যের যেন একটা সম্পর্ক আছে।

চন্দ্র বসে বসে ভাবে। এভাবে তরুবালার কতদিন চলতে পারে ?

কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তবে এটা ও ঠিক বুঝতে পারে যে তরুবালা বাঁধা সুরের গান নয়। একই নিয়মে ওঠানামা করতে জানে না। এক রকম থাকতে পারে না।

—কই, ওঠো।

চন্দ্র চমকে তাকায়। এ কি !

একটা থালায় লুচি, আলুর তরকারি, গোটা দুয়েক সন্দেশ। আর এক হাতে এক গেলাস জল।

ধীরে ধীরে ওঠে ও।

—কিন্তু এই না বললে মুড়ি ?

তরুবালা হেসে ফেলে,—মুড়ি যদি খাও এর পর আনিয়ে দেয়া যাবে।

চন্দ্র বোঝে তরুবালা ওটা ঠাট্টা করেছিল।

—কিন্তু এত ?

তরুবালা আগের মতোই হাসে,—তাও তো বটে। মানুষটা তো তেমনি রোগাই আছ। একটুও বাড়োনি, খাওয়া বাড়বে কী করে শুনি ? তার চেয়ে খাওয়া বাড়াও। শরীর বাড়বে।

চন্দ্র কথা বলে না আর। সব খেয়ে উঠতে পারে না। লুচি কয়েকখানা পাতে পড়ে থাকে।

—খেয়ে নাও। ভালো ঘিয়ের তৈরী।

—ঘি খারাপ তা তো বলি নি।

—কিছুই তো বল না। হয় ভালো বল। নয় তো খারাপ বল।

উঠে হাত মুখ ধুয়ে আসে চন্দ্র।

তরুবালা ওই পাতেই আর খান কয়েক লুচি আর তরকারি নিয়ে খেতে বসে।

চন্দ্র তরুবালার বিছানায় উঠে বসে।

—এটা কিন্তু ঠিক নয়। —ওর পাতে তরুবালাকে খেতে দেখে সঙ্কোচ হয়।

—কোনটা ?

তরুবালার চোখ দুটো হাসছে। খঞ্জন পাখির মতো চঞ্চল।

—এই মানে, কারো পাতে খাওয়া।

তরুবালা তাকায়। ওর বড় বড় চোখ দুটো তুলে তাকায় চন্দ্রর দিকে।

—ছোটবেলায় যখন আধখানা পেয়ারা কামড়ে নিয়ে আমায় খেতে দিতে তখন তো এ কথা বলতে না। এখন বুঝি জ্ঞান-গম্যি বেড়েছে ?

চন্দ্র অবাক হয়। কথাটা সত্যি। কিন্তু এমন করে বলতে বোধহয় তরুবালাই পারে।

ও আর কথা বলতে পারে না।

—তাই বলে—? তরুবালা লুচি মুখে তোলে।

চন্দ্র তাকায় জিজ্ঞাসু চোখে।

—তাই বলে আর কারো পাতে খেতে পারি না। খাইও নি।

চন্দ্র তাকিয়েই থাকে।

—বরের পাতেও খাই নি।

হঠাৎ চন্দ্র বলে ফেলে—কোন বর?

কথাটা অত্যন্ত বোকার মতো বলে ফেলে। এ রকম মাঝে মাঝে হয়। এক-একটা কথা এমন বেখাপ্পা বলে ফেলে ও, পরে নিজের কানেই শুনতে বিশ্রী লাগে। কেন যে এমন বলে, এটা কি ওর চিররুগ্ন মনের কোনো অভিব্যক্তি?

তরুবালার দিকে অপরাধীর মতো তাকায় একবার।

তরুবালার মুখখানা মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে যায়। তবু জোর করে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বলে,—বর আবার মানুষের কটা হয়? বউ বরং চার-পাঁচটা হতে পারে।

চন্দ্র কাঠ হয়ে বসে থাকে।

—যা জানতে চাইছ, তাও বলতে পারি। মোনাদার পাতেও কখনও খাই নি। বিয়ের পর স্বামীর পাতেও নয়।

তরুবালা মুখে লুচি তোলে।

—যদি বল, তোমার পাতে কেন খাচ্ছি? তুমি কি আজকের? এইটুকু বয়েস থেকে এঁটো খাইয়ে খাইয়ে অভ্যেস করে দিয়েছ যে।

—তা সত্যি।

—আমার এঁটোও কিন্তু খেয়েছ। কাসুন্দি দিয়ে যখন আম মাখতুম। আমার ভাগ তুমি খেতে না?

—খেতুম ভালো লাগত বলে।

একটু খুশী হয় তরুবালা। হয়তো বা চন্দ্রও ওকে খুশী করবার জন্যে, বলে, ভালো লাগত বলে।

থালাটা নিয়ে তরুবালা ওঠে।

—শুধু আমমাখাই ভালো লাগত ?

চন্দ্র কথাটার মানেটা ঠিক ধরতে পারে না।

তরুবালা হাসছে। হাসিটা ওর চোখে, মুখে নয়।

—বোসো। আসছি।

এঁটোটা পেড়ে নিয়ে বেরিয়ে যায় তরুবালা।

চন্দ্র তেমনি চুপ করে থাকে। বিছানাটা গুটিয়ে শুধু সতরঞ্চিতে শুয়ে পড়ে চন্দ্র। অবেলায় খাওয়াটা বেশি হওয়ায় একটু ঝিমুনি আসে। চোখের পাতাদুটো ভারি মনে হয়।

বারান্দার ওপাশ থেকে হাওয়া বইছে। বারান্দার জালের ভেতর দিয়ে নদীর জোলো বাতাস।

ঘুম পায়। ঘুমিয়েই পড়ে চন্দ্র হাতের ওপর মাথা রেখে।

ঘুম যখন ভাঙে তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে। রাত কতটা ঠিক বুঝতে পারে না।

দেখে ওর মাথার নীচে বালিশ। বালিশটা কে দিয়ে গেছে গোপনে বুঝতে দেরি হয় না।

বারান্দা থেকে রান্নার শব্দ আসে শুধু। ঘরের প্রদীপটা কাঁপছে নদীর জোলো বাতাসে।

মাথাটা একটু ভারি মনে হয় ওর।

উঠে কাত হয়ে বসে থাকে। ভাবছে, উঠবে কিনা। কাকে ডাকবে ?

তরুবালা আজ রান্না করছে হয়তো। আর কনক?

আস্তে আস্তে ওঠে চন্দ্র। নাঃ! মাথাটা বড্ড ভারি লাগছে।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকারটা পাতলা। ময়লা রুপোর মতো ভাসা ভাসা আলোয় দেখতে পায় চূর্ণী নদীর ক্ষীণ জলধারা শাখার মতো বেঁকে গেছে ওধারে। তারই ওপাশে কয়েকটা আলো। বোধহয় দু-চারখানি ঘর। ভাঙা ঘাটের ধারে তখনও দাঁড়িয়ে আছে একটা গোরু। গোরুটার কি কেউ নেই?

রাত কত হল?

বারান্দার প্রান্তে রান্নাঘরের দিকে এগোয় চন্দ্র।

রান্না করছে তরুবালা। উনুনের আগুনের আলো পড়ে মুখখানা ওর জ্বলজ্বল দেখাচ্ছে।

বড় বড় চোখদুটো ওর অচঞ্চল এখন। রাঁধতে রাঁধতে কিছু একটা ভাবছে বোধ হয়। পাতলা ঠোঁটটি দাঁতে কামড়ে কড়াটা নামায়। কী একটা কড়া থেকে ঢেলে আঁচলটা দিয়ে মুখ মোছে।

মুখ মোছে, না চোখ?

মুখখানি ওর অস্বাভাবিক গম্ভীর।

চন্দ্রর কেমন ভয় ভয় করে। বরাবরই ও তরুবালাকে ভয় করে এসেছে। আজও কেমন ভয় করে। শুধুই কি ভয়; তবে তরুর জন্যে ওর এত টান কেন? কেনই বা রানাঘাটে আসা?

তরুবালার দুর্বার আকর্ষণকেই বোধকরি ভয় করে চন্দ্র।

তরুবালার সাহসের সীমা নেই। আকর্ষণও সুতীব্র। কখন যে কী করে বসে ও। তাই তো এত ভয়!

ভালো করে তাকায় চন্দ্র।

তরুর চোখের পাতা দুটো ফুলো-ফুলো, একটু যেন ভেজা-ভেজা।

চন্দ্রর বুকটার ভেতর কেমন করে।

হঠাৎ ওর মনে হয় আজ জীবনে বোধহয় কখনও সুখ পায় নি তরুবালা। এখনও সন্ধান করেই কাটছে ওর জীবন। শুধুই অন্বেষণ। আনন্দের অন্বেষণ। পূর্ণতার অন্বেষণ। কবে যে জীবন প্রশান্তিতে ভরে উঠবে! কে জানে!

তরুবালা কড়াটা চাপিয়ে দিয়েছে আবার।

চন্দ্র আর দাঁড়াতে সাহস পায় না। জানে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুই মনে করবার নেই। তবু কেন যেন ও সাহস করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে আসে।

সতরঞ্চির ওপর এসে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে।

ঠিক যা ভেবেছে তাই। একটু পরেই তরুবালার পায়ের শব্দ পায়।

তাড়াতাড়ি চোখ দুটো বোজে চন্দ্র।

আরও একটু পরে ওর গায়ের ওপর একখানা হাতের স্পর্শ পায়। তরুবালার হাত কত ঠাণ্ডা। মোমের মতো স্পর্শ।

হাতখানা আস্তে আস্তে ওর কপালের ওপর আসে। তারপর চুলের ভেতর আঙুলের স্পর্শ।

চন্দ্রর বুকটা কাঁপতে থাকে। তরুবালাকে ও সবদিক থেকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। কিন্তু তরুবালার হাতখানা আবার কপালের ওপরে এসেই থেমে যায়।

চোখ বুজে জাগ্রত স্নায়ু দিয়ে অনুভব করে চন্দ্র। এ স্পর্শে তাপ নেই। ওর কাছে কেন যে তরু এত ঠাণ্ডা! ওর সঠিক প্রকৃতিটা যেন সুপ্ত হয়ে যায় চন্দ্রর কাছাকাছি এলে।

—ঘুমোলে ?

চন্দ্র উত্তর দেয় না।

আবার তরুর ডাক শোনে।—ঘুমোলে নাকি ?

চন্দ্রকে একটু আড়মোড়া ভাঙতে হয়। চোখ কচলাতে হয়। গভীর ঘুম থেকে ওঠবার ভান করতে হয়। উঠে বসে ধীরে ধীরে।

বলে,—ওঃ! অনেক রাত হয়ে গেছে বোধহয় ?

—খুব বেশী নয়।

—খাওয়া মিটে গেছে তোমাদের ?

তরু হাসে না। গম্ভীর মুখে বলে,—না। এই রান্না সেরে এলুম।

—কিন্তু—।

—কিন্তু কী ?

—আজ তো চলে গেলে হত!

—কেন বলো তো ?

—না, মানে, এত রাত্রে কি আর যাওয়া যাবে ?

তরু গম্ভীর মুখেই বলে—তা যাবে। রাত্তিরে ট্রেন আছে।

চন্দ্র ভালো করে তাকায়।

ও ভেবেছিল তরু নিশ্চয়ই বলবে, নাই বা গেলে। যেতে দোব না। এখানে কি ভূতের ভয় ?

কিন্তু এ একেবারে উলটো।

ভয়ে ভয়ে তাকায় চন্দ্র। তরুর গলাটা বড়ই গম্ভীর।

চন্দ্রই বলে,—থাক গে, আজ নাই গেলুম।

—তবে থাক।

—কিন্তু—।

তরু তাকায়।

চন্দ্র বলে,—বিছানা ?

—ও ঘরে বিছানা করে দিয়ে কনক চলে গেছে।

—কনক এসেছিল ?

—তা নইলে বাজার করবে কে ? রাঁধব কী ?

চন্দ্র চুপ করে থাকে।

একটু পরে বলে,—তবে তো মুশকিল হল। তুমি কি রোজ একা থাক ?

—কনক মাঝে মাঝে থাকে। তা ছাড়া আর মানুষ পাব কোথায় ?

—ভয় করে না একা থাকতে ?

—ভয় ?—এতক্ষণে একটু ম্লান হাসে তরু,—এর পরও কি আমার ভয় করলে চলে।

চন্দ্র আর কী উত্তর দেবে।

তরু ওর পাশে বসে। চুপ করে বসে থাকে। মুখ তেমনি গম্ভীর।

সময় কাটছে। চন্দ্র ভাবল একবার খাবার কথা বলবে কিনা। কিন্তু বলতে পারল না।

চুপ করে থাকতেই ভালো লাগছে। পাশাপাশি বসে এমন করে—প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে পারা—এও কি কম ?

একসময় তরু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

খুব আস্তে আস্তে বলে,—মাঝে মাঝে তোমার ওপর খুব রাগ হয়।

চন্দ্র চুপ করে থাকে। এতকাল পরে কি তার ভীরুতার বিচার করবে তরু ?

তরু ওর দিকে মুখ না ফিরিয়েই বলে,—মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি ভীষণ বোকা। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমার চেয়ে চালাক আর কেউ নেই।

চন্দ্র তাকায় তরুর দিকে।

তরু চন্দ্রর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তেই বলে,—আচ্ছা, তুমি কী বলো তো?

চন্দ্র কী জবাব দেবে? তরুর দিকে তাকায়।

—ওই! তোমার ওই রকম তাকানি দেখলে সত্যি আমার গায়ে জ্বালা ধরে।

চন্দ্র চোখ নামায়।

—বলো না। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে একবার বলো, তুমি কী?

তরু একটু উত্তেজিত হয়েছে, একটু থেমে আবার বলে,—এখানে তো কেউ নেই! তুমি শুধু আমাকে তোমার ভেতরটা আজ দেখাও।

চন্দ্রর গলা কাঁপে,—কী দেখাব?

—তোমার আসল রূপটা।

—কী জানি। আমি তো জানি না।

চন্দ্রর কথাগুলো আটকে যায়।

—তুমি সব জান। তুমি কি জানতে না যে এক বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছিল, জানতে না যে সেই বিয়ে আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ঘা দিয়েছিল। নইলে কী করে তুমি দু-দিন পালিয়ে বেড়ালে।

চন্দ্রকে জবাব দিতেই হয়,—সত্যিই আমি জেনে কিছু করি নি।

—তবে?

—অ্যাঁ! কী করে বলি,—তখন কেমন যেন—।

—কী?

চন্দ্র মুখটা নীচু করে।

তরুবালা ওর আরও কাছে বসে,—আজ আমার দশা দেখে

কী মনে হয় তোমার? কী আছে আমার? মেয়েমানুষের যা থাকবার কিছুই নেই।

আমি কী হয়েছি! দেখছ?

চন্দ্র কিছু কিছু কি বোঝে না? তবু তরুরও যে দোষ ছিল সে কথা ও কিছুতেই বলতে পারে না। তরুর বিচার করবার সাহস ওর নেই।

—তুমি যদি সেদিন জোর করে আমায় টেনে নিতে—।

চন্দ্র কিছুতেই বলতে পারে না যে, তাহলেও হয়তো ভালো হত না। ভালো যে কী হত ও কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। তার ভালো হবার মতো জীবন নয়।

—কেন তা তো বললে না?

চন্দ্র বলে আস্তে আস্তেই—ভয়ে।

—কিসের ভয়?

চন্দ্র একটু ভেবে বলে,—সেটা ঠিক জানি না।

তরু চুপ করে বসে থাকে।

আর একটা কথাও বলে না। বলবার প্রবৃত্তিও বোধ করি হয় না ওর।

চুপ করে বসে থাকে দুজনেই।

বাতাসটা কি বন্ধ হয়ে গেছে? কেমন একটা গুমট গরম লাগে চন্দ্রর। ছোট ছোট চোখ দুটো ওর স্তিমিত হয়ে আসে। কিসের ভাবনায় ঠিক বুঝতে পারে না। কী একটা ভাবনা উঠতে চায় ভেসে মনের অতল থেকে। যেন মনের তলায় তলিয়ে যায়, ভাসতে পারে না।

—চলো। খেতে চলো। —বলে তরু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

চন্দ্র ওঠে নীরবে।

বারান্দায় গিয়ে একটা আসন পেতে দেয় তরু। ভাত বেড়ে এনে দেয় সামনে।

চন্দ্রর খিদে বোধ নেই আর। বিস্বাদ লাগে সব রান্না।

তরু একটু বিষণ্ণ হেসে হেসে বলে,—জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেল।

চন্দ্র ভাত মুখে তোলে। বিস্বাদ।

—এর চেয়ে মরে যাওয়াই ছিল ভালো।

চন্দ্র তাকায় একবার। ভয়ে ভয়ে। তরুবালার মরবার কথা শুনে ওর মুখটা খুলে যায়।

—তার চেয়ে বরং—।

—কী ?

—তার চেয়ে বলছিলে একটা ইস্কুল করবে ? তাই করো না।

কথাটি বড় সুন্দর বলেছে চন্দ্র।

তরুর খুব ভালো লাগে কথাটা। ও চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ কী এক চিন্তায়। চোখ দুটো ওর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে।

—তাই করব।

—তবে আর দেরি কেন ? সামনের সপ্তাহ থেকেই একটা ব্যবস্থা করা যাক।

তরুর স্বরটা যেন সহজ হয়ে আসে ক্রমে—কিন্তু—কী করে কী করা যায় ?

চন্দ্র ভাতের স্বাদ পাচ্ছে আবার। কথা বলতে মন্দ লাগছে না।

খেতে খেতেই বলে,—একটা ঘর ঠিক করো। তারপর স্কুলের একটা নাম দিয়ে উদ্বোধন করে ফেলো। কিছু টাকা খরচ হবে।

তরু বলে,—হুঁ। অন্তত তিনটে বেঞ্চি। একখানা চেয়ার আর একখানা টেবিল।

—উহুঁ।—বলে চন্দ্র,—একটা সতরঞ্চি কিনলেই চলবে এখন। উদ্বোধনে একজন সভাপতি ঠিক করে কিছু লোককে নিমন্ত্রণ করো। কলকাতায় তো এমন হয়েই থাকে।

তরুবালা চোখে মুখে খুশী। ফিকফিক করে হাসে।

—ঠিক বলেছ তুমি। তাই করব। দিন পনেরো লাগবে সব ব্যবস্থা করতে। ততদিনে শরীরটাও একটু সেরে উঠবে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে চন্দ্রর। উঠে পড়ে ও।

তরুবালা ভাবনায় মশগুল। হাতমুখ ধুয়ে চন্দ্র ঘরে যেতে চায়।

তরু নিজের ভাত বেড়ে নিয়ে ওকে ডাকে—এখানে বোসো না একটু।

চন্দ্র ওর সামনে বসে। তরুবালা খেতে আরম্ভ করে।

—তুমি কিন্তু আসবে ঠিক। সামনের শনিবার আসবে। তারপরের শনিবার। তারপরের শনিবারও।

—কেন?—চন্দ্র এতক্ষণে একটু হাসতে পারে।

—বাঃ! তুমি না এলে কী করে কী হবে? আমি একা কী করব?

চন্দ হাসতে হাসতেই বলে,—তুমি সব করতে পারবে। তোমার ইচ্ছেটা ঠিকমতো হলে কাজ করতে তোমার আটকাবে না।

তরু হাসে,—তবু তুমি পাশে থাকলে আমার ভরসা।

চন্দ্র হাসে শুধু।

তরুবালা আর কথা না বলে ভাবতে ভাবতে খাওয়া সেরে নেয়।

খাওয়া সেরে এঁটো ফেলে ঘরে আসে। চন্দ্রও ততক্ষণে ঘরে এসেছে। তরুর চৌকির ওপর সতরঞ্চিটায় কাত হয়ে বসে আছে।

তরু চোখদুটো তোলে একবার।

হঠাৎ বলে,—এ ঘরেই শোবে?

কথাটা শুনে চমকে ওঠে চন্দ্র।

—আমার বিছানায় শুতে পার। আমি না হয় তোমার পায়ের কাছে—

চন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে তরু হেসে বলে,—তোমার ওপর আমার অনেক বিশ্বাস। আমি জানি, সবাই সব কাজ পারে না।

চন্দ্র আস্তে আস্তে ওঠে। ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। একটা কথারও জবাব দেয় না। তরুবালা জবাব পেয়ে যায়।

ও বোধহয় কথাটা বলে ঠিক করে নি। উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে এ ঘরে শোবার কথা না বললেই হত। আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ে তরুবালা।

চন্দ্র পাশের ঘরে কনকের পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ে। চুপ করে চলে না এসে বললেই হত, ও ঘরে যাই। তরু কি অপমানিত হল? হলেই বা সে কী করতে পারে। যাক গে।

একটা হাই তোলে চন্দ্র। বড় ঘুম পাচ্ছে। এত কথা বলা ওর অভ্যাস নেই।

তরুর সঙ্গে অনর্থক এত বকে ওর শরীরটা কেমন ক্লান্ত লাগছে। চোখদুটো টেনে আসে। ঘুমিয়ে পড়ে চন্দ্র।

সাত

পরের শনিবারেও এসেছিল চন্দ্র। একটু সকাল সকাল এসেছিল। এসে দেখল তরু বাড়ি নেই। দোর খুলে দিলে কনক।

—তরু কোথায় ?

—দিদিমণি বসুমল্লিক মশায়ের বাড়ি গেছে ?

—কে ?

—এঁজ্ঞে নীরেন বসুমল্লিক। মস্ত লোক। ইস্কুলের কী সব কাজে গেছে সেখানে।

স্কুল নিয়ে মেতে উঠেছে তাহলে তরুবালা। কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হল চন্দ্র। এই রকম একটা কিছুতে না মাতলে ও বাঁচতে পারবে না। মত্ততাই যে ওর স্বভাব।

ধীরে ধীরে তরুর ঘরে এসে ওর চৌকিটার ওপর বসে।

কনক জিজ্ঞেস করে,—আপনি কি চা খাবেন ?

—না থাক।—বলে চন্দ্র জামাটা খুলে ফেলে। চৌকির ওপর রাখে। বলে,—এক গেলাস জল দাও। ঠাণ্ডা জল।

কনক জল দেয়। দিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়।

চন্দ্র বসে থাকে তেমনি চৌকির ওপর। গোটানো সতরঞ্চিটা পেতে নিয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে থাকে। একবার ভাবে বেরোবে কিনা। না, বেরোতে ইচ্ছে হয় না।

আপনা-আপনিই মনে হয়, কেন ও আসে এখানে ? আজই বা

কেন এল? তরুবালা বলেছিল, তাই। তাই কী? নিজের মনের কি কোনো তাগিদ ছিল না? মনের তলায় ডুবে দেখতে আর ইচ্ছে হয় না।

তাগিদ না থাকলেও আসতে যে বেশ ভালো লাগছিল, এ কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মেস থেকে বেরোবার সময় এখানকার কথা ভাবতে ভালো লাগছিল। ট্রেনে আসতে আসতে ভাবতে ভালো লাগছিল তরুর কথা।

আজও কি গিয়ে দেখবে তরু জানলায় বসে আছে? তার জন্যে অপেক্ষা করছে? তরু যদি তার জন্যে অপেক্ষা করত, তবে যে তার খুব ভালো লাগত, এটাও তো অস্বীকার করতে পারছে না।

বরং এসে যখন দেখল তরু কী এক বসুমল্লিকের বাড়ি গেছে, তার কথা ভাববারই হয়তো সময় পায় নি। কনককেও কিছু বলে যায় নি। তখন মনটা কেন যেন ওর বিরক্তিতে ভরে উঠল। ও জানে এ কথা কাউকে বলা যাবে না। তবু মনের ভাবতরঙ্গগুলো এতই সুউচ্চ যে নিজেরই চোখে পড়ছে।

নিজের একটু লজ্জাও যেন হচ্ছে। তরুবালার জন্যে এত মাথাব্যথা ওর কেন? বিপদে পড়ে একটা চিঠি দিয়েছিল। পরিচিতা বলে সে এসেছিল বিপদে কিছু সাহায্য করবে বলে। আর বেশী কি?

বেশী যা কিছু, সবই তো তরুবালার দিকে। ওর দিকে তো সবই শূন্য।

কথাগুলো ভাবতে ভালো লাগে, কিন্তু মন মানে না।

গরমে ঘাম হচ্ছে চন্দ্রর। কোঁচার খুঁটে ঘাম মুছে ফেলে ও। আবার শুতে যায়। না থাক। শোবে না। উঠে যায় বারান্দায়। জালের ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে। খুব কম। জোরালো বাতাস

নয়। রোদটা মাঠের ওপর ক্রমে নরম হয়ে আসছে। বিকেল হয়ে এল।

—কই, গেলে কোথায় ?

তরুবালার গলার আওয়াজ শুনতে পায়।

—এই হেথাকে ছেলেন একটু আগে।—কনকের গলা।

—তা দেখলি নে মানুষটা গেল কোথায়।

চন্দ্র বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। ইচ্ছে করেই সাড়া দিল না। সাড়া দিতে ভালো লাগল না। মাঝে মাঝে ওর এমন হয়। মনের গতিকে মুখ যেন কে চেপে ধরে। বোবা হয়ে যায়।

—এই তো।

তরুবালা বারান্দায় ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

চন্দ্র একটুও চমকায় না। আস্তে আস্তে মুখ ফেরায়।

—অনেকক্ষণ এসেছ তো ? কনকটাকে বলে রেখেছি এলে একটু জলখাবার করে দিবি। ওটা যে কী হচ্ছে দিন দিন।

চন্দ্র বলে,—আমিই বারণ করেছি। ওর দোষ নেই।

তরুবালার দিকে চন্দ্র ভালো করে তাকায়। সবুজ সিল্কের শাড়ি, বুকের জামাটাও সবুজ। চোখের কোণে যেন একটু কাজল টানা।

তরু যে রূপসী না মেনে উপায় নেই। রুক্ষ চুল সামনেটা কোঁকড়া, পেছনে আলগোছে খোঁপা বাঁধা।

সিল্কের শাড়ির আঁচলটা বারবারই বুক থেকে নেমে পড়ছে পিছলে পড়ছে। কিন্তু কেন এত সজ্জা ?

চন্দ্র মুখ ফেরায়।

তরুবালার মুখটা একটু রাঙা হয়ে ওঠে—একটু দাঁড়াও, এগুলো ছেড়ে আসি। বলে তরুবালা ঘরে ঢুকে দোরটা ভেজিয়ে দেয়।

চন্দ্র দাঁড়িয়েই থাকে। দেখে কনক গেল রান্নাঘরে। বোধহয় উনুনে আগুন দিতে। কিছুক্ষণ পরে তরু বেরোল।

ওর পিঠে একখানা হাত রেখে বললে—ঘরে বোসো।

চন্দ্র আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে গেল। গিয়ে আবার সেই চৌকির ওপরেই বসল। তরুবালা ততক্ষণে রান্নাঘরে ব্যস্ত।

কিছু সময়ের ভেতরেই লুচি পটলভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

—কই, ওঠো।

চন্দ্র তাকাল,—আমি তো বলেছিলাম কনককে, খেতে খুব ভালো লাগছে না।

—না লাগুক। সকালে খেয়ে ট্রেনে উঠেছ। খিদে না থেকে পারে? ওঠো।

অগত্যা উঠতেই হয় চন্দ্রকে।

তার আগেই তরু চৌকির ওপর রেকাবিটা এনে রাখে।

—এখানে বসেই খাও।

চন্দ্র হাসে একটু,—আচ্ছা আমি কি শুধু খাবার জন্যেই আসি?

—তাই না হয় এলে। মেসে হোটেলে কে আর তোমার খাওয়ার দিকে নজর দিচ্ছে বলো? একটু মুখ বদলাতেও তো মানুষের ইচ্ছে হয়।

—ওই ইচ্ছেটা আমার কখনও হয় না।

—তোমার না হোক, আমার হয়।

চন্দ্র বলে—তোমার ইচ্ছেমতো আমাকে চলতে হবে?

—এখন তাই চলতে হবে। চিঠি পেয়ে এসেছিলে কেন? না এলেই পারতে?

চন্দ্র হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে,—না এলেই বোধহয় ভালো হত।

মুহূর্তে তরুবালার মুখটা ম্লান হয়ে যায়।

তবুও জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে বলে। সে কথা এখন ভেবে লাভ নেই।

বলে হঠাৎ উঠে চলে যায়।

চন্দ্র একটু বোধহয় বুঝতে পারে তরুবালার কোথায় আঘাত করেছে ও। তবু স্পষ্ট কথা বলাই ভালো। তরুর কাছে মিথ্যে বলতে ও পারবে না।

তরু কিন্তু একটু পরেই আবার ঘরে ঢোকে।

চন্দ্র যেন ওকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই বলে—কই, আর দুখানা লুচি দাও?

—এই যে বললে খিদে নেই?

তরু বাইরে গিয়ে লুচি হাতে আবার ঘরে ঢোকে। আস্তে আস্তে এসে চৌকির ওপর বসে। লুচি দুখানা রেকাবিতে দিয়ে বলে—শোনো, আজ নীরেনবাবুর কাছে গিয়েছিলাম।

—তাই নাকি?—চন্দ্র মুখ তোলে,—নীরেনবাবু কে?

—ও বাবা! সে এখানকার নেতা। মস্ত বড়লোক। বড় ভালো মানুষ।

সত্যিই চন্দ্রের মুখটা নীচু হয়ে যায়। অস্ফুট স্বরে বলবার চেষ্টা করে—তাই নাকি?

—কী সুন্দর চেহারা! যেমন লম্বা, তেমনি গায়ে গতরে। ধবধবে রঙ। দেবতা বলে মনে হয়। কিন্তু কী বলব, এতটুকু অহঙ্কার নেই। অতি অমায়িক।

চন্দ্র মুখ তুলে তাকায় না। বোধকরি তাকাতে পারে না।

তরুবালা হাসে, কেন কে জানে।

বলতে থাকে তেমনি,—সব খবর রাখেন। আমি যেতেই বললেন,

আমি জানি, আপনার স্বামী তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। দেশের পুরুষগুলো যে কী পাষণ্ড! তারপর কত কথা বললেন, আপনার স্কুলের ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব। কিছু টাকাও তুলে দোব। আপনাদের মতো অনাথাদের জন্যে আমরা সবই সাহায্য করতে প্রস্তুত।

তরুবালা থামে না,—কত বড় মানুষ বলো তো! মনটা কত উঁচু। তারপর কিছুতেই ছাড়বেন না। নানা কথা। কোথায় দেশ। কে আছে।

—তুমি কী বললে?—চন্দ্র এতক্ষণে মুখ তোলে।

—আমি বললুম আমার কেউ নেই। সব মরে গেছে। আমি একা। আশ্রয় নেই, সহায় নেই, আপনাকেই সব করতে হবে। তারপর আরও কত আলাপ। খাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না। আবার কাল যেতে বললেন বিকেলে। ইস্কুলে গিয়ে আরও কথাবার্তা হবে। আমার দু-একটা গানও শুনলেন। মানে, দেখলেন যে আমি ঠিক গান শেখাতে পারব কি না।

চন্দ্র মুখটা আবার নীচু করে বলে,—ঘর ঠিক হল?

—হ্যাঁ। এখন এই বাড়ির পাশে ওই জায়গায় একটা ঘর তুলে নেব। কাল থেকেই লোক লাগাব। টিনের ঘর। পরে আরও বাড়ানো যাবে।

চন্দ্র গেলাসে হাত ধোয়।

—কই, লুচি দুখানা চেয়ে নিলে, খেলে না?

চন্দ্র তাকায় তরুর দিকে। তরুর চোখের কাজল এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বলে,—থাক। আর ভালো লাগছে না।

তরু খাবার নিয়ে আর পেড়াপেড়ি করে না।

বলে,—এমন একটা বড় মানুষ সহায় থাকলে দুদিনে ইস্কুল জমে যাবে। কী বলো ?

চন্দ্র শুধু বলে,—নিশ্চয়ই।

তরু রেকাবিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

একটু পরেই সন্ধ্যা নেমে আসে। চন্দ্র চোখ বুজে চৌকির ওপর শুয়ে থাকে।

ভাবে, এরপর ওর আর থাকবার কী দরকার ? নীরেনবাবু ভার নিচ্ছেন। বড়মানুষের সাহায্য পাচ্ছে তরুবালা। টাকার অভাবও নেই। কাজও এসে জুটবে অনেক। আর এ কাজে হয়তো বা তরু জীবনে আনন্দের পথ খুঁজে পাবে। তাই পাক। তরুর ভালো হোক। তরু পথ খুঁজে পাক। তার আসবার আর প্রয়োজন হবে না।

না আর বেশী ভাবনা নয়। আস্তে আস্তে জামাটা পরে। উঠে দাঁড়ায়। বারান্দায় এসে দেখে তরুবালা রান্নাঘরে।

ওকে উদ্দেশ করে বলে,—আজ একটু কাজ ছিল। আমি কলকাতা যাচ্ছি।

—কী ?—তরু মুখ ফিরিয়ে তাকায়। আপাদমস্তক লক্ষ্য করে চন্দ্রকে। তারপর গম্ভীর স্বরে বলে,—ঘরে যাও। আমি আসছি।

তরুবালার আদেশ। অনুরোধ নয়।

চন্দ্র একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকে। চলে যাবার যত ইচ্ছেই হোক না কেন, তরুকে ও ছোটবেলা থেকে ভয় করে মনে মনে। ওর কথা না শুনে চলে যাবার সাহস চন্দ্রর নেই। আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে বসে চন্দ্র। বেশ অনেকটা সময় কাটে। তরু রান্নাঘর থেকে আসে না।

চন্দ্র একবার ভাবে যাবে নাকি রান্নাঘরের সামনে। না থাক।

তরু এতক্ষণে ঘরে ঢোকে। বোধহয় রান্না শেষ করে।

একখানা গামছায় হাত মুছতে মুছতে চন্দ্রর কাছে এসে দাঁড়ায়।

—কী ভেবেছ বলো তো ?

—কই কিছুই তো ভাবি নি।—চন্দ্র স্বরটা যতটা পারে সহজ করে বলে।

তরু বসে পড়ে,—ছাখো আমার কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা কোরো না। তোমার মনের কথা সব আমি জানতে পারি।

চন্দ্র হাসতে চেষ্টা করে।—তুমি রাগ করছ কেন ?

তরুর গলাটা ভারী হয়ে আসে,—বেশ তো, চলে যাবে যেও। কাল সকালে যেও। আজ এভাবে হঠাৎ চলে গেলে লোকেই বা কী ভাববে, আর নিজের কাছেই কি নিজে ছোট হয়ে যাবে না ?

চন্দ্রকে চুপ করে থাকতে হয়।

—এখন তো বয়েস হচ্ছে। এখনও কি ছেলেমানুষি যাবে না ?

চন্দ্র চুপ করে থাকে।

—তোমার চুপ করে থাকা দেখে গা জ্বলে যায়। যাবে তো যাও। এখুনি চলে যাও। বলে তরু বেরিয়ে যেতে যেতে চোখ মোছে।

চন্দ্র একটা কথাও বলতে পারে না। বলবার আছেই বা কী! ও যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে দোষটা আজ ওর যত বেশী তরুর হয়তো বা তত নয়।

হঠাৎ এমনভাবে চলে যাবার কথা বলার পেছনে যে মনোভাবটা আছে সেটা বড়ই লজ্জার। সেটা এত গোপন যে নিজের আবিষ্কার করতেও সময় নেয়। একদিন কাপুরুষের মতো ভীতুর মতো যাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে হয়েছিল, আজ তাকে কাছে টানতে যাওয়ার মতো লজ্জার কথা আর কী আছে ?

চন্দ্রকে চুপ করে থাকতে হয়।

কনকের গলার আওয়াজ পায়। রান্নাঘর ধোবার শব্দ আসে।

রাত বোধহয় অনেক হল।

আর কোনো শব্দই পাওয়া যায় না। তরু কোথায় গেল? বেরিয়ে গেল নাকি কোথাও? আজকের এ ব্যাপারের পরেও কি তরু তাকে ক্ষমা করবে? চিরকালই তো তরু ওকে ক্ষমা করে এসেছে। আজও বোধকরি তরু ক্ষমাই করল।

অনেক পরে ঘরে ঢুকে বলল,—এসো। খাবে এসো।

চন্দ্র আর একটা কথাও না বলে জামাটা খুলে ওর পেছন পেছন বারান্দায় গিয়ে আসনে বসে। একটা স্বস্তির ভাব দেখা দেয় ওর মনে।

আট

অন্ধকার ঘরে বসে চাটুজ্যে হাসতে চেষ্টা করেন। দিনের পর দিন স্বপ্নের মতো কেটে গেছে। আগাগোড়া জীবনটাই যেন আবছা আবছা এক স্বপ্ন। কতকাল কেটে গেল। কত দিন গেল, কত রাত গেল। শুধু ভাবের তরঙ্গ আছড়ে আছড়ে পড়ল আত্মার বেলাভূমিতে। কী অদ্ভুত লাগে। তরঙ্গ সমুদ্র নয়। তবু তরঙ্গও তো মিথ্যে নয়। কোটি কোটি অনন্ত ঢেউ উঠছে। আছড়ে পড়ে ভেঙে ফেনায়িত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবু সেও সত্য।

কী হাসিই পায়। হাসতে গিয়ে কাশির বেগ সামলান চাটুজ্যে। হাঁটুর ভেতর মাথাটা ঝুঁকে পড়ে। ভাবতে আরাম লাগে আবার।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু মনের ভাবকে রোধ করা গেল না। ওঁর জীবনে এক খাপছাড়া অধ্যায়। খাপ খাবার উপায় তো ছিল না। তরুর স্বভাবে যে বন্য চাঞ্চল্য সেটা ওঁর মনের কোনো এক জায়গাতেও খাপ খেল না। তবু তরুবালা যে এত বেশী করে এত আপনার হয়ে ওঁর জীবনে কেমন করে এল, এইটে ভাবলে বড়ই অদ্ভুত লাগে। সংসারে বোধহয় এমন অদ্ভুত এক-একটা পরিচয় হয়ে যায়। সে পরিচয় গাঢ় হয়, নিগূঢ় হয়, কিন্তু কোথায় যে একটা মস্ত ফাঁক থেকে যায় সেটা টের পাওয়া যায় না।

একদিন এই ফাঁকটা এমন করে স্পষ্ট হল যে সেটা আর ভোলা গেল না। তরুও ভুলতে পারল না। তরুর কোনো দোষ নেই। বারবার

ক্ষমা করলেও সেদিন বোধহয় ক্ষমা করতে পারল না। চন্দ্রও ভুলতে চেষ্টা করল না। এক অসহায় অবস্থায় জীবনটাকে ভাসাল। আজ তারই জের চলছে।

কে জানে কেন সেদিন শনিবার একটু আগেই গিয়ে পড়েছিল চন্দ্র। তার আগে বহু শনিবার কেটে গেল। দীর্ঘ কয়েক বছর। অজয়ের বাড়িতেই থাকে তখন চন্দ্র। অজয়কে পড়ায়।

তরুবালার গানের স্কুল তখন বেশ জমে উঠেছে। গুটি তিরিশেক মেয়ে আসে রোজ সন্ধ্যায়। শনিবার, রবিবার আরও আসে। বাড়ির পাশেই লম্বা টালির ঘর হয়েছে। বারান্দা। হাতে-টানা পাখা। কমক তো আছেই। ওর বাড়ির ঝি, স্কুলেরও ঝি। ধীরে ধীরে বেশ সুনামও করে ফেলেছে তরুবালা।

ওর কথায় আলাপে স্পষ্টই বোঝা যায় যে স্কুলের মেয়েগুলোকে ভালোবাসে। প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসে। ভালোবাসা হয়তো স্বাভাবিক। ছোটদের ভালোবাসাই বোধহয় সবচেয়ে সহজ আর ঢালাও। এতে হিসেব করতে হয় না। লাভ লোকসান বিচার করতে হয় না। ঢেলে দেওয়া যায় মনপ্রাণের সবটুকু আবেশ। নিশ্চিন্তে পরম আরামে।

ভালোবাসার নিরাপদ স্থান দেখতে পেয়েছে তরুবালা। এবার ও বিলিয়ে দেবে নিজেকে ওদের ভেতর এতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু ওরা যখন বড় হবে? ওরা যদি জানতে পারে সব? তখন যদি ওরা ওকে ঘৃণা করে? সে ঘৃণা কি সইতে পারবে তরু? হয়তো বা পারবে। তখন যারা ছোট থাকবে, তাদের নিয়ে মেতে থাকবে ও। হয়তো ও-সব কথা কানেও যাবে না। গেলেও কানে তুলবে না।

চন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলত। তবু আবার যেত শনিবার।

হয়তো তরুবালার দেখাই পেত না। স্কুলে রয়েছে। হয়তো সেদিন আবার মিটিং আছে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে।

সন্ধ্যের পর এসে নিজেই হয়তো কৈফিয়ত দিত,—এই ছাখ, তুমি বসে আছ? কী করি বলো। ইস্কুলে এত কাজ পড়েছে। ও কনক!

কনক আসে।

—চাকরটাকে একবার পাঠিয়ে দে। বাজারে যাবে।

তারপর রান্না সেদিন নিজেই করত তরু। হয়তো মাংসের ঝোল। একটু মাছের ঝোল। একটু মাছের ঝাল। বলত,—কী করি বলো তো? একা আর পেরে উঠছি নে। ক্লাসিক্যাল তো আমি দেখছি। শ্যামা-সঙ্গীত, রবি ঠাকুরের গান। এ-ও অনেক মেয়ে শিখতে চায়। নীরেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আর-একটি মেয়েকে মাইনে দিয়ে রাখব ভাবছি। আচ্ছা, কলকাতায় কোনো মেয়েকে পাওয়া যায় না?

চন্দ্র চুপ করে থাকত।

—দেখো না একটু খোঁজ করে। ভালো গাইতে পারে শ্যামা-সঙ্গীত রবীন্দ্র-সঙ্গীত, এমন একটা মেয়ে? দেখবে?

চন্দ্র শুধু বলে,—দেখব খোঁজ করে।

তরু বলে,—তাই দেখো। একা আর পারি নে বাপু। দিন দিন মেয়ে বাড়ছে। বেশ লাগছে কিন্তু—!

তরু নিজের খুশিতে নিজেই হাসে।

চন্দ্র তাকিয়ে দেখে তরু একটু ফুলেছে, একটু মোটা হচ্ছে। ও আর কোনো কথা বলে না।

বছর ঘুরে যাচ্ছিল এমনি করেই। তরুর বয়স যত বাড়ছে, ততই যেন রূপ ফেটে পড়ছে। ঠাণ্ডা বিনম্র রূপ। একটু মোটাও হচ্ছে

ক্রমে। তাকিয়ে দেখতে ভালো লাগত চন্দ্রর। তরু বলত,—কী দেখছ, ফুলছি দিন দিন ?

চন্দ্র কথা বলত না। তরু হয়তো কাছে এসে বসে চন্দ্রর জামার বোতামগুলো একবার খুলত। একবার বন্ধ করত। বলত স্কুলের কথা। ওর মুখে অন্য কথা শোনা যেত না। শোনবার আশাও করত না চন্দ্র।

সেদিন শনিবারে একটু আগেই এসেছিল চন্দ্র। ঠিক কোনো একটা বিশেষ কারণে নয়। সকাল থেকে শরীরটা ভালো ছিল না। না খেয়ে চলে এসেছিল। তখন বেলা বারোটা। শীতের রোদটা কড়া বটে, কিন্তু মিষ্টি। হেঁটেই এসেছিল স্টেশন থেকে। দরজাটা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিল কনক।

ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল চন্দ্র।

কী একটু ভেবে কনক বললে,—একটু দাঁড়ান।

ভেতরে চলে গেল।

একটু পরে ঘুরে এসে বললে,—মা বললে, আপনি একটু বাইরের ঘরে বোসো।

চন্দ্র একটু অবাক। ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে,—কেন ?

কনক গলা বাড়িয়ে ফিসফিস করে বলে,—নীরেনবাবু খেতে বসেচেন যে !

বলেই কনক ভেতরে অন্তর্ধান হয়ে যায়।

কনকের কথাগুলো বুঝতেও ওর কিছুটা সময় লাগে। নীরেনবাবু ভেতরে খেতে বসেছেন। মানে নীরেনবাবু এখানে যাতায়াত করে থাকেন। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হন। বিনা নিমন্ত্রণে খাবার মানুষ তো নীরেনবাবু নন। অন্তত যতদূর তাঁর সম্পর্কে শোনা গেছে, তাতে

নীরেনবাবুর সময়ের দাম অনেক। বহু কাজ তাঁর। বহু টাকা, বহু খ্যাতির সঙ্গে মিশে কাজের ধরনও অসাধারণ রকমের।

সেই নীরেনবাবু এখানে খেতে এসেছেন। নিশ্চয়ই নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে, তরুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে।

তরুর কাছে এর আগে শুনেছে ওকে মাঝে মাঝেই নীরেনবাবুর কাছে যেতে হয়। নিশ্চয়ই সেদিনের মতো পিছলে সবুজ শাড়ি পরে যেতে হয়। একটা ব্যাগ কিনেছে তরু। সেটাও বোধহয় হাতে ঝুলিয়ে যেতে হয়।

নীরেনবাবু নাকি অতি মিষ্টি কথা বলেন। মাঝে মাঝে তরুকে জীবনের মানে বোঝান। তরু নাকি শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায়।

বিয়ে করেন নি নীরেনবাবু। জীবনে নাকি বিয়ে করবার সময়ই পান নি। এত পরোপকারী আর এমন কর্মী!

এ সব কথা তরুবালার কাছ থেকেই শুনেছিল চন্দ্র। কথাগুলো শুনত ওর স্বাভাবিক নির্লিপ্তভাব মনে রেখে। তাই হয়তো বা কোনো কথা ওর মন ছুঁয়ে যেত না। শুনত, তারপর ভুলে যেতে পারত। অন্যকথা ভাবতে পারত।

আজও হয়তো কিছুই মনে করত না চন্দ্র। কিন্তু খিদেয় ওর পেটটা শুকিয়ে গেছে। তার ওপর এত রোদে অনেকটা পথ হেঁটেই এসেছে। তাই কথাগুলো যেন মনটাকে বিষিয়ে দিলে। চন্দ্র আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল।

ও কোনোমতেই বুঝতে পারল না যে নীরেনবাবু খেতে বসবার জন্যে ওর বাইরের ঘরে অপেক্ষা করবার কী কারণ থাকতে পারে। কিছু না। কোনো কারণ থাকতে পারে না।

চন্দ্র আজ বোধ করি প্রথম তরুবালার কথা অমান্য করে বসল।

ও উঠে আস্তে আস্তে বারান্দায় এল। দেখতে পেল রান্নাঘরে কনক। বারান্দা পেরিয়ে একেবারে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দেখতে পেল ভেতরের ঘরে সত্যিই খেতে বসেছেন ভদ্রলোক। এই প্রথম দেখল চন্দ্র। ভদ্রলোক সত্যিই বলিষ্ঠ রূপবান। চওড়া কপালের ওপর উলটে আঁচড়ানো কালো কোঁকড়া চুল। মুখ নীচু করেই ছিলেন।

চন্দ্র দাঁড়াল চুপ করে, আর এগোল না।

—আর একটু কোর্মা দিই!

বলে তরুবালা ঘুরে দাঁড়িয়ে চন্দ্রকে দেখে হঠাৎ কিছু বলতেই পারল না। মুখটা ওর সাদা হয়ে গেল।

চন্দ্র লক্ষ্য করল একখানা পাতলা গরদের শাড়ি পরেছে তরু। সাদা পরিষ্কার আঁট জামা গায়ে। শুধু হাতে নয়, বুকেও আঁট হয়ে আছে জামাটা। চুল রুক্ষ নয় আজ। সুস্নিগ্ধ সদ্যঃস্নাত। তখনও ভেজা-ভেজা। আর ঠাণ্ডা ভেজা-ভেজা চোখের পাতা। অপরূপ সেজেছে তরুবালা।

এত বছরের ভেতর চন্দ্র কখনও ভাবতেও পারে নি যে তরু এমন নিখুঁত সাজতে পারে। তরুবালা কিন্তু মুহূর্তে সামলে নেয়

মিষ্টি হেসে বলে,—আপনি কখন এলেন?

আপনি—কথাটা বড় বেশী কানে লাগে।

তরু ওকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে বলে,—বসুন চৌকিতে

তারপর নীরেনবাবুর দিকে দেখিয়ে বলে,—ইনি নীরেনবাবু রানাঘাটে ওঁর নাম জানে না এমন মানুষ নেই। ইনিই আমার ইস্কুলের একমাত্র সহায়।

নীরেনবাবু ততক্ষণে একটু অবাক হয়ে দেখছেন চন্দ্রকে। তরু তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে,—আর ইনি। চন্দরদা। ইয়ে মানে আমাদের গাঁয়ের—

—একজন গরিব মানুষ। হাতজোড় করে বলে চন্দ্র—নমস্কার।

নীরেনবাবু মাথা নেড়ে প্রতিনমস্কার করেন। একটু হাসেন শুধু। কী বুঝে হাসছেন কে জানে।—আমি ততক্ষণ একটু বাইরে বসি।

তরু অবাক হয়ে তাকায় চন্দ্রর দিকে। চন্দ্রর গলা এত কর্কশ হতে পারে তরু কখনও জানত না। তরু কিছু বলবার আগেই চন্দ্র বেরিয়ে যায়। বারান্দা দিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে চৌকিটার ওপর বসে পড়ে। ওর ছোট ছোট চোখদুটো জ্বালা করছে ভীষণ। দুহাত দিয়ে চোখদুটো একবার ডলে নেয়। এমন সময় তরুবালা ঘরে ঢোকে। চন্দ্র ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে,—অপরূপ সেজেছ। এমন করে আগে সাজলে তোমাকে হয়তো বিয়েই করে ফেলতুম। নয়ত নিয়ে পালাতুম।

তরুর মুখটা কালো হয়ে ওঠে। চন্দ্র এমন কথা বলতে পারে!

চন্দ্র মিটিমিটি হাসছে,—সত্যি। কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়। ইচ্ছে হচ্ছে, তোমায় নিয়ে নরকে যাই।

তরুবালার কালো মুখটা ক্রমে কঠিন হয়ে ওঠে।

চন্দ্র বলে,—তোমার স্বামী কেন মরেছে, বুঝলুম। মোনা কেন পালাল বুঝলুম। এমন পরিষ্কার করে আর কখনও বুঝি নি। চিরকাল আগুন জ্বালালে আর পোড়ালে। নিজে যে কবে পুড়বে জানি নে।

চন্দ্রর ছোট ছোট চোখদুটো চিকচিক করে ওঠে। চন্দ্র এত কথা বলতে পারল কী করে? এ যে পরম আশ্চর্য!

তরু শুধু বলে,—চলে যেও না। কথা আছে।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

চন্দ্র একা একা বসে থাকে।

বসে থাকবার আর কী প্রয়োজন আছে? একটু ঠাণ্ডা হবার পর

বুঝতে পারে চন্দ্র যে এমন অসংযত হওয়াটা তার কোনোমতেই উচিত হয় নি।

যত সময় যায় যত ঠাণ্ডা হয়ে আসে ততই বুঝতে পারে যে এত বেশী উত্তেজিত হওয়া অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। তা ছাড়া এটা তার স্বভাবও নয়। তার স্বভাবের বিরুদ্ধে বলেই হয়তো তরু হঠাৎ কিছু বলতে পারে নি।

এটা কী করে বলল চন্দ্র ? এমন কঠিন কথা সে তো জীবনে কাউকে বলে নি। তার মনের অবচেতন স্তরে কি নীরেনবাবুর সঙ্গে তার একটা তুলনা করেছিল সে ? তুলনা করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল ? হতাশ হয়ে পড়েছিল ? নাকি ঈর্ষা ?

ঈর্ষা করা তো তার স্বভাব নয় !

আর তা ছাড়া তরুর সম্বন্ধে তার দুর্বলতা জীবনে এমন করে কখনও প্রকাশ পায় নি। দুর্বল সে আজন্ম। জীবনে কিছু চাইতে জানে না। পায় না। পেলে নিতে ভয় পেয়ে যায়।

আজ তার এমন হল কেন ?

নিজের কাছে নিজের জবাবদিহি করতে করতে ঘেমে ওঠে চন্দ্র।

জুতোর শব্দ শুনে তাকায়।

নীরেনবাবু ঢুকলেন ঘরে। বেরোবার রাস্তা এই ঘরের ভেতর দিয়ে।

—নমস্কার !—নীরেনবাবু চমৎকার একটু হেসে হাত দুটো কপালে তোলেন।

চন্দ্র প্রতিনমস্কার করতে তো পারেই না। মুখটা কালো করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

নীরেনবাবু বেরিয়ে যান। জুতোর মচমচ শব্দটা ওর কানেই শুধু

আসে না, বুকের ভেতরেও লাগে। তরুবালা আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে এগোয়। দোরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকে—কনক!

কনক এসে পড়ে।

—তুই তাহলে এখন যা। স্নান সেরে আয়। এখানেই খাবি।

কনক বেরিয়ে যায়।

তরুবালা আবার এগিয়ে আসে। দোরে খিল দেয়।

গম্ভীর মুখে এসে চন্দ্রর কাছে বসে।

—একটা কথা ছিল। তাই বসতে বলেছিলাম।

চন্দ্র তাকায়।

তরু তেমনি গম্ভীর স্বরে বলে,—আমি অনেক ভেবে ঠিক করেছি। তোমার সঙ্গে কাল সকালবেলা কলকাতায় চলে যাব। এখানকার পাট উঠিয়ে দেয়াই ভালো। কী বলো?

চন্দ্র তাকিয়ে থাকে। কপাল থেকে ঘাম মোছে।

—না। তোমার কাছেই থাকব। তুমি যা বলবে তাই করব।

তরুবালার গলাটা খুব গম্ভীর শোনায়।

চন্দ্র চুপ করে বসে থাকে।

—এ রূপ এ দেহ মন সবই তোমার। অনেককাল থেকে। তোমাকে এত ছোট করে আর আমি রাখতেও চাই নে। দেখাতেও চাই নে। কাল সকালেই যাব কলকাতায়।

চন্দ্র একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে,—কিন্তু—

—না। এতে আর কোনো কিন্তু নেই। আমি আর কোনো কথা শুনব না।

—কিন্তু কলকাতায় জায়গা কই?

—কেন, তোমার কাছে।

—আমি তো পরের বাড়ি থাকি।

—সেখানেই যাব।

—সেখানে—!—চন্দ্র চুপ করে।

—কেন, কেউ কিছু ভাববে? সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে নোব। লোকে বলবে স্ত্রী।

চন্দ্র আকাশ থেকে পড়তে পড়তে যেন শূন্যে আটকে গেছে। পায়ে মাটি পাচ্ছে না।

বলতে চেষ্টা করে,—কিন্তু এত হঠাৎ—।

—ভালোবাসায় আবার হঠাৎ আছে নাকি?

—আমি তো তেমন কিছু—।

—তেমন কিছু বল নি। এই তো? বলতে তো আর কিছু বাকী রাখ নি। বিয়ে করতে চাইলে। পালাতে চাইলে। আর এখন নিতে ভয় পেলে চলবে কেন?

চন্দ্র কী বলবে ভাবছে। কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

—আধঘণ্টা আগে যেমন সুন্দর ছিলুম, এখনও তেমনি সুন্দর আছি। তাকিয়ে দেখো। এ দেহটা চাও তুমি তো কখনও বল নি। আজ যখন চাইলে, তখন ভাবলুম, এ ছাই দেহটা তোমাকে দেয়াই ভালো।

কথাগুলো শানিত তীরের মতো বিঁধছে চন্দ্রর বুকে।

—নীরেনবাবুর নজর এ দেহটার দিকে একটু-আধটু থাকলেও সে এখনও চেয়ে বসে নি। তাকে সে সুযোগ না দেয়াই ভালো।

—কী বলছ তুমি? চন্দ্রর গলাটা কাঁপে।

তরু নিষ্ঠুর হাসে,—তুমি আমাকে যত সস্তা ভেবেছ, তার চেয়ে বেশী সস্তা হলেই বা আর বাধা কী? তোমার যা ভাববার তুমি তো ভেবেই ফেলেছ।

চন্দ্রর সর্বাঙ্গ ঘামছে। চোখদুটো স্তিমিত হয়ে আসছে।

তরু এক অভিনব ভঙ্গীতে চন্দ্রর চিবুকটা ধরে বলে,—দেখো, কত রূপ আমার!

চন্দ্র ওর হাত ধরতেই তরু ওর হাত জড়িয়ে ধরতে চায়।

আর সহ্য করতে পারছে না চন্দ্র।

কাঁপতে কাঁপতে ও মুখটা নীচু করে তরুর হাতখানা দুহাতে ধরে রুদ্ধ স্বরে বলতে চেষ্টা করে,—আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার যোগ্য নই।

তরুবালা আর কথা বলে না।

প্রখর রোদে রাস্তাটা নির্জন। বাড়িটাও। অনেকক্ষণ বাড়িতে কোনো মানুষ আছে বলে মনে হয় না। বারান্দায় একটা বেড়াল বোধহয় এঁটো থালাগুলো ফেলে দিল। বাসনের শব্দ শোনা যায়।

বোবা মানুষ দুজন বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলে না।

তরুবালা একটা বড় নিশ্বাস ফেলে।

—আর কতবার ক্ষমা করা যায়! অন্য কেউ হলে—।

তরুবালা যেন নিজের মনেই বলে।

চন্দ্রর বিশুষ্ক গালের ওপর জলের দাগ। কিন্তু তাতেও তরুর মনের দাগ বোধ করি আর মোছা গেল না। তরু কি এবারে আর ক্ষমা করতে পারবে না? বোধহয় না।

আরও অনেক পরে তরু আর-একটা নিশ্বাস ফেলে।

—তবে আজ একটা কথা দাও।

—বলো।

—আমি জীবনের একটা পথ খুঁজে পেতে চাইছি, ছোট ছোট

মেয়েগুলোকে পেয়ে তাদের নিয়ে ইস্কুল করে। তাদের ভালোবেসে আমি যদি শান্তি পাই, তাতে তুমি কেন বাধা দেবে?

—বাধা তো দিই নি।

—ঠিকই। তুমিই তো এ পথ আমাকে দেখিয়েছ। তবে কথা দাও।

—কী?

—তুমি আমার কোনো কাজে কিছু মনে করতে পারবে না।

তরু বলতে বলতে একটু যেন উত্তেজিত হয়েই বলে ফেলে,—তুমি বোধহয় জান না। এই কাজে আমি এমন পথ খুঁজে পাচ্ছি, যে পথে তোমাকেও আমার প্রয়োজন নেই। তোমারও সেখানে জায়গা নেই।

চন্দ্রকে ধীরভাবে কথাটা মেনে নিতে হয়। কথাটা যে ও একেবারে বোঝে নি তা নয়। বুঝেও কি বুঝতে চায় নি? কে জানে?

তরু বলে,—তবু তুমি আসবে। তোমাকে আসতেই হবে। যদি বল, কেন? বোধহয়—বোধহয় মনের কোথায় যেন তোমার জন্যে একটুখানি জায়গা আছে, এখনও। পরে সেটুকু থাকবে কিনা জানিনে।

চন্দ্র কথা দেয়,—আসব আমি। আর কোনো কথাই কখনও বলব না।

তরু চন্দ্রর মাথাটা নিজের হাতের ওপর টেনে নেয়।

গলাটা কাঁপে বলতে বলতে,—তোমার কথাও ভাবি। কোথাও কিছুই তো পেলে না। চাইলেও না।

চন্দ্রর গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে। কথা বলতে পারে না।

তরুবালা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

চন্দ্র মাথাটা ওঠায় যখন, তখন বাড়ির ঠিক মাথায় সূর্য।

তরু ওঠে এবার। এসো। খাবে এসো।

তরুর পেছন পেছন চন্দ্র বারান্দায় আসে। আসন পেতে দেয় তরু। রান্নাঘরে যায় ভাত দিতে। ভাত বেড়ে এনে সামনে দিয়ে একটু মুখ টিপে হেসে বলে—তোমার জন্যে কিন্তু পোলাও কোর্মা নয়। ভাত মাংসের ঝোল।

একটু থেমে আবার বলে—তুমি আটপৌরে কিনা!

চন্দ্র কোনো কথার উত্তর দেয় না। নীরবে খেয়ে উঠে যায়।

তরুবালার চৌকিটার ওপর গিয়ে গা মেলে দেয়।

নয়

এর পরেও বছরের পর বছর কেটে গেছে। অজয়ের বাড়ি থেকে প্রতি শনিবার রানাঘাটে এসেছে চন্দ্র। ফিরেছে রোববার।

কথা ঠিক রেখেছিল চন্দ্র। এরপর থেকে কখনও আর কিছুই বলে নি তরুকে। মন্দ তো বলেই নি। ভালোও বলে নি। বোবা হয়ে থাকাটাই অভ্যেস করেছে। অধিকারের প্রতিষ্ঠা যেখানে কোনদিনই হল না, সেখানে কতকগুলো কথা বলা বৃথা। তাতে অনর্থ বাধবার সম্ভাবনাই বেশী।

অধিকার হয়তো আছে, কিন্তু অধিকারকে চন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে জানে না, জীবনেও পারল না। কিসের প্রতিষ্ঠাই বা আছে ওর জীবনে। ওর জীবনটাই যেন আলগা-আলগা কেটে গেল। দেওয়া আর পাওয়া। দুটোই আলগা।

শনিবারে গিয়ে যথারীতি চন্দ্র দেখত, তরুবালার মরবার সময় নেই। স্কুল আরও বেড়েছে। দিন দিন বেড়ে উঠেছে।

পাশেই টালির ঘর করেছে একটানা অনেকগুলো। সেখানে একটা পড়বার প্রাথমিক স্কুলও শুরু করেছে তরুবালা।

কাজের ভেতরে কোথায় যে হারিয়ে যাচ্ছে তরুবালা, ও নিজে তো জানেই না। চন্দ্রও বুঝে উঠতে পারে না। বোঝবার চেষ্টাও বড় একটা করে না ও।

শনিবারেও তরুবালার ফিরতে সন্ধ্যে। ফিরে এসে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে চন্দ্রর সঙ্গে ভালো করে কথা বলতেও পারে না।

শুধু জিজ্ঞেস করে হয়তো,—জলখাবার খেয়েছ ?

চন্দ্র ঘাড় নাড়ে।

তরুবালা শাড়ি তোয়ালে নিয়ে পাশে নদীর ঘাটেই গা ধুতে চলে যায়।

ফিরে এসে চুল আঁচড়ে নিজে কিছু খেয়ে নেয়। বেশীর ভাগই দুধ খায়। তারপর চন্দ্রর কাছে হয়তো একটু বসে।

কোনোদিন হয়তো বলে,—শরীরটার দিকে একটু নজর দাও। দিনদিন রোগা হয়ে যাচ্ছ।

চন্দ্র হাসে। হয়তো বলে,—আর তুমি ?

—আমি তো ফুলছি। আচ্ছা, যেখানে থাক, সেখানে কি তেমন যত্ন হয় না তোমার ? অসুবিধে হয় ?

চন্দ্র একটু ভেবে বলে,—না। তেমন অসুবিধে আর কী!

—তোমার অজয়ের বুঝি একটি ছেলে হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

তরুবালা মুখটা হঠাৎ যেন কালো হয়ে যায়,—আপন মনেই বলে, —আহা, বেঁচে থাক। কেমন দেখতে হয়েছে ?

—আমি এখনও ভালো করে দেখি নি।

তরুবালা হেসে ফেলে,—তুমি কী ? বাড়িতে একটা ছেলে হল আর তাকে দেখলে না পর্যন্ত !

চন্দ্রও হাসে হয়তো।

তরু বলে,—আমার এখানে কত মেয়ে! সব আমার নিজের মেয়ের মতো।

চন্দ্র কাত হয়ে শুয়ে পড়ে।

—কিন্তু একটাও ছেলে নেই।

তরুবালাও মেঝের ওপর কাত হয়ে শোয়।

আর কোনো কথা হয় না।

রোববারটা তরুবালা বেরোয় না। তবু বিকেলের দিকে স্কুলের কমিটির মিটিং থাকে। নানা কাজ থাকে। যেতে হয়। বেরোতে হয়।

চন্দ্র বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে বেরোয়।

তরুবালা হয়তো বলে,—সকাল সকাল ফিরো। ঠাণ্ডা পড়ছে।

চন্দ্র ফেরে বেশ দেরি করে।

তরুবালা কৈফিয়ত চায় না আর। রাত্রে ফিরে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে চন্দ্রর খবর নেবার মতো মনের অবসর থাকে না। মনটা তো একটা, তাই দিয়ে কত দিকে আর ভাববে?

অনেক সময় বাড়িতেও লোকজন আসত। নীরেনবাবুও আসতেন মাঝে মাঝে। চন্দ্রকে দেখতেন। কোনো কথা বলতেন না। ঠিক যেন গ্রাহ্যই করতেন না।

তরুবালার মতো রূপসী অসাধারণ বুদ্ধিমতী কর্মী-মহিলার সঙ্গে এ লোকটার যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে, এ সকলের ধারণার বাইরে।

দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয় হবে হয়তো। কিছু সাহায্য-টাহায্য পায়। দু-পাঁচ টাকা দেয়। দু-এক বেলা থেকে খেয়ে যায়, তাই আসে।

সবাই এই কথাই ভাবে। চন্দ্র প্রতিবাদ করবে কি? কারো সঙ্গে পারতপক্ষে কোনো কথাই বলে না।

কে জানে তরুবালা লোকের কাছে তার কী পরিচয় দেয়? অত জানবার কৌতূহল আর চন্দ্রর নেই। আসল পরিচয় যদি কিছু থাকে, সেটা যে তরু সবাইকে বলতে পারে না. এ কথা নিশ্চিত। তরুবালা এখন এখানকার ওপরতলার সমাজের একজন বিশিষ্ট মহিলা।

সমাজকে তরুবালাও এখন ভয় করে। তার প্রতিষ্ঠার নড়চড় হবার ভয় করে। তার প্রতিষ্ঠানকে বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

চন্দ্রর কথা বলে তরু তার এতবড় লাভকে ছাড়তে পারে না।

তা ছাড়া বলবার আছেই বা কী?

কোন এক অতীতে কোন এক চন্দ্রকে তার গ্রামের দামাল মেয়ে তরুবালা ভালোবাসত। সে তরু তো আজ বেঁচে থাকতে নাও পারে। বেঁচে না থাকলেও কিছু বলবার থাকতে পারে না।

বরং চন্দ্রই আজও ধুকধুক করে বেঁচে আছে।

আজও তার তরুর কাছে আসতে ভালো লাগে। শুধু একটু কাছে বসতেও ভালো লাগে। দুটো কঠিন কথা শুনতে ভালো লাগে। চারটে অনুযোগ শুনতে ভালো লাগে।

এ ভালোলাগা কি চন্দ্র অস্বীকার করতে পারে?

বয়স পড়ছে। দেহ ভাঙছে, দুজনেরই। স্কুল বড় হচ্ছে। মন ছড়িয়ে পড়ছে। দেহ ভেঙে চলেছে।

আজ আর তরুবালার দেহের সীমান্তে সীমান্তে জোয়ার নেই। ভাটার টান ধরেছে।

তবু চন্দ্র আসে। ভালো লাগে, তাই আসে।

তবু চন্দ্র এলে খুশী হয় তরুবালা। ভাটার দিনেও একটু ঘূর্ণি।

কথা প্রায় হয়ই না।

—কখন এলে?

চন্দ্র হয়তো বলে,—এই তো।

এই পর্যন্তই। তারপর শোবার আগে একবার হয়তো ওর ঘরে আসে তরুবালা। ওর কাছাকাছি একটু কাত হয়ে শোয়। বড্ড মোটা হয়েছে তরু।

—মাঝে মাঝে কোমরটায় ফিক ব্যথা হয়।

চন্দ্র তাকায় শুয়ে শুয়ে।

—বাত-টাত হল নাকি?

চন্দ্র একটু ভেবে বলে,—পা কি ফোলে?

—একটু একটু বোধহয় ফোলে।

একটু ভেবে আস্তে আস্তে বলে চন্দ্র,—সামনের হপ্তায় ওষুধ আনব।

হোমিওপ্যাথি ওষুধ। অসুখে-বিসুখে সব সময়ই দেয় চন্দ্র। তরুকেও দেয়।

তরু বলে,—তাই দিও। মনে করে ঠিক এনো কিন্তু। বরং পাঁচটা টাকা নিয়ে যেও।

চন্দ্র চুপ করেই শুয়ে থাকে।

পাঁচটা টাকা দিলে ও নেবে। না নেবার কারণ আর কীই বা থাকতে পারে! মান-অভিমানের পালা বহুকাল আগে চুকে গেছে।

বয়েসও অনেক হল। আবেগগুলো আর তরল নেই। পাথর হয়ে গেছে।

কোনোদিন হয়তো তরু বলে বসে,—অজয়ের ছেলেটিকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

—কেন? চন্দ্র হাসে।

রাসুর কথা চন্দ্রর কাছে বসে বসে শোনে তরুবালা। তাই বলে,—তুমি যে বল, ভারী দুরন্ত। একদিন নিয়ে এসো না!

চন্দ্র চুপ করে থাকে।

—কী হল? আনবে?

চন্দ্র মুখটা গম্ভীর করে বলে,—আমার সঙ্গে ছাড়বে কেন?

তরু কী একটু ভেবে গম্ভীর হয়ে যায়। আর কিছু বলে না।

মাত্র মাসখানেক আগে চাটুজ্যে যেদিন গেলেন, তরুবালা কথা বলতে পারে নি। কাজে ব্যস্ত ছিল খুব বেশি। চাটুজ্যে রইলেন, বেড়ালেন, খেতেও পেলেন, থাকলেন। শুধু শোবার আগে তরুবালা একবার এসে বলেছিলেন,—সোমবারটা থেকে যাও না। মিনিস্টার আসছে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে।

চন্দ্র কপালে হাত দিয়ে একবার তাকিয়েছে শুধু। কথা বলতে ভালো লাগে নি। শরীর-ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। তরুবালাকে কিছু বলতে চান না। তরুবালাও জানতে চায় না। এই-ই ভালো। নিরুত্তর চন্দ্রর দিকে তাকিয়ে তরুবালা বলে—দেখ যদি পার থাকতে।

চন্দ্র এ-কথারও জবাব দেয় না। রবিবার যথারীতি চলে আসে। তরুবালা তখন বোর্ডিংয়ে ব্যস্ত।

দশ

আজ প্রায় এক মাসের ওপর হয়ে গেল, রানাঘাটে যাওয়া আর হয় নি। তরুবালা কি একটু খোঁজ নিতে পারত না? হয়তো ঠিক মনে নেই। কিন্তু মনে না থাকবারই বা কী কারণ। এত বছরের ভেতর একমাস রানাঘাটে যায় নি এমন কখনও হয় নি। শনিবারেও কি মনে পড়ে নি?

মনে হয়তো পড়েছে। ভেবেছে, একটা খবর হয়তো ঠিকই পাবে।

চাটুজ্যেরই কি খবর দেওয়া উচিত ছিল? তরু হয়তো ওর কাছ থেকে কোনো খবরের অপেক্ষায় আছে। খবর দেবেন কী করে? ন দিন তো চাটুজ্যের জ্ঞানই ছিল না। লিখবেন কী করে? থরথর করে হাত কাঁপে। তরুবালা একটা চিঠি দিতে পারত!

না দিয়েছে, ভালোই হয়েছে। একটুও অভিযোগ নেই চাটুজ্যের।

সংসারে অভিযোগ করা যায় না। অভিযোগ করবার মানুষ মেলে না। চাটুজ্যের চেয়ে এ কথা আর কে বেশি জানে।

তরুবালা ওর জীবনের একমাত্র জমা। আর সবই তো খরচের ঘরে।

ভোর হতে আর দেরি নেই। মোটা মোটা থামের ওপারে আকাশটা ঘোলাটে হয়ে এসেছে। আবছা হয়ে আসছে তারাগুলো। জানলার বাইরে তাকান চাটুজ্যে। রাস্তায় এক-আধটা মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। ওই তো মই কাঁধে দৌড়ে গেল মানুষটা ডানদিকের গ্যাসের আলোর কাছে। মইয়ে উঠে নিভিয়ে দিল আলো।

যাবার সময় হয়ে এসেছে। রাসু উঠবে একটু পরেই। তারপর ওর মা ঠাকুমা। তারপর অজয়।

অজয় বড় দেরিতে ওঠে। অজয় উঠলেই চলে যাবেন চাটুজ্যে।

কোথায় বা যাবেন? কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠে কী একটা আবেগে। তরুবালার ওখানে কি যাবেন? ভাবতেই শরীরটার ভেতর কেমন একটা ঝাঁকানি লাগে। মুখটা গরম মনে হয়। কেন এমন হয়?

আবার সেই অসহ্য কাশি।

পাঁজরগুলো বুঝি ভেঙে যায়। হাঁপ নিতে নিতে কৌটোর মুখ খুলে থুতু ফেলে নিজেই আবার চমকে ওঠেন একটু। রঙ স্পষ্টই লাল। আবার রক্ত!

কপালের ঘামটা মোছেন কোঁচার খুঁটে। ছেঁড়া জামার বুকটা আর ঢাকা যায় না। চওড়া লাল পাড়ের তাঁতের শাড়ি পরা তরুবালার কাছে কত বেমানান। তরুবালা তাঁকে মানিয়ে নিতে তো কখনও চায় নি। চাটুজ্যে নিজে সেধেও কখনও বলেন নি। আজ কি সেধে বলতে হবে? ঘামের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা কেঁপে ওঠে আবার।

কাশির বেগটা সামলে নিতে হয়। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েছেন চাটুজ্যে, এ কথা নিশ্চয়ই জানেন। আজীবন এই সত্যকেই জানতে চেয়েছিলেন নীরবে। মৃত্যুর সত্য। এত ভুগেছেন জীবন ভরে যে মৃত্যুর চিন্তা থাকত প্রায় সব সময়ই। ওই চিন্তার ভয়টাকে দূর করতে চেয়েছেন এতকাল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! আজ মরতে হবে জেনে ভয়টা যেন বেড়ে যাচ্ছে। জীবন যে মানুষের এত প্রিয় আজ মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সেটা বুঝতে পারছেন।

যক্ষ্মায়ও তো মানুষ বাঁচে। মানুষ বাঁচে, কিন্তু চাটুজ্যের বাঁচবার পথ কোথায়? চাটুজ্যে কি মানুষ?

জীবনের ওপর কত টান আজ প্রত্যক্ষ বুঝতে পারছেন চাটুজ্যে। আর সাতদিন আটদিন কী দশদিন পরে এ শরীর থাকবে না। বুকের ওঠানামা বন্ধ হয়ে যাবে। এ মুখে আর কথা বলা যাবে না। এ চোখে আর দেখা যাবে না। দেহটাকে পোড়াতে হবে শ্মশানে। ভাবতেই যেন ভেতর থেকে কে বলছে—না। না। মরবে না সে, মরতে চায় না।

কে বলে? চাটুজ্যে কান পেতেও তার হদিস পান না।

কী এক অদৃশ্য টানে সব কটা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে মনের কাছে নালিশ জানায়—কথা বলতে চাই, দেখতে চাই, বাতাস চাই, শুনতে চাই, বাঁচতে চাই। বাঁচতে চাই। কী নিদারুণ টান! তবু মরতে হবে।

চাটুজ্যের চোখদুটোয় হতাশা নেমে আসে। তবু মরতে হবে। বাঁচবার কোনো পথই নেই। কোনো পথই কি নেই? হাসপাতালে গেলে তো মানুষ বাঁচে। হাসপাতালে গেলেও তো হয়! যার কেউ নেই, সে তো হাসপাতালেই যায়।

তবু বাঁচতে চান চাটুজ্যে। আরও কিছু দিন। আরও কিছু কাল।

ভাবতে ভাবতে ঘেমে ওঠে কপাল। হাত দিয়ে মুছে হাঁপাতে থাকেন। ভালো করে নিশ্বাস নিতে না পারার যে কী কষ্ট! এর চেয়ে মরা ভালো নয়কি? ভেবে আর কূলকিনারা পান না চাটুজ্যে। আবার আকাশের দিকে তাকান। জানলার মাপে ছোট চৌকো একটুখানি আকাশ। ওইটুকুই যেন মুক্তি। ওইটুকুতেই একটু ছড়িয়ে নেন নিজের মনকে।

সকাল হয়ে গেছে। এবার উঠতে হয়। সবাই উঠলে চাটুজ্যে

উঠে ভেতরে যেতে পাবেন না। বারণ আছে। হাতমুখ ধোবার কাজ সকালেই সেরে নিতে হয়।

ধীরে ধীরে ওঠেন চাটুজ্যে। মুখটা নীচু করে কাঁপতে কাঁপতে এগোন গলিটা দিয়ে।

—ও দাদু!

তাঁর জামায় টান পড়ে। তাঁকে ছুঁল কে? তিনি তো আজ একমাস অস্পৃশ্য! কেউ ছোঁয় না। কেউ কাছে আসে না। সকলের চোখেই স্পষ্ট দেখতে পান একটা ভয়াল দৃষ্টি।

—দাদু!

মুখ তোলেন চাটুজ্যে। পেছন থেকে জামা ধরে টানছে রাসু।

রাসু একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়।

—দাদু, তুমি নাকি আজ চলে যাবে? বাবা বলছিল কাল রাত্তিরে?

চাটুজ্যে দাঁড়ালেন।

—সত্যি চলে যাবে?

চাটুজ্যে দাঁড়াতে গিয়ে একটু ভয় পান। যদি রাসুর মা দেখে ফেলে!

—একটু সরে দাঁড়া।

রাসু সরে না।

—একটু সরো, আমি যাই কলতলায়।

রাসু গলির সামনের দরজাটায় দাঁড়িয়ে বলে—যেতে দোব না।

—দুষ্টুমি কোরো না। সরো।

রাসু নিজের নাকটা টিপে বলে—এই তো নাক টিপে আছি! মা বলেছে নাক টিপলে আর টি. বি. আসে না।

চাটুজ্যের হাসি পায়। কিন্তু হাসতে পারেন না।

—টি. বি. বুঝি নাকের দিকে লাফিয়ে আসে ?

জ্বালালে ছেলেটা। ওর মা এলে এখুনি চেঁচামেচি শুরু করে দেবে।

রাস্থর পাশ দিয়ে চলে যান চাটুজ্যে। রাস্থ ওঁর জামা টেনে ধরে।

—বলো, আজ যাবে ?

—হ্যাঁ। আজই যাব।

রাস্থ জামাটা ছেড়ে দেয়—আর আসবে না ?

—না।

রাস্থ ছুটে পালিয়ে যায়—আর একটা কথাও না বলে।

চাটুজ্যে একটু সময় ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কলতলার দিকে এগিয়ে চলেন।

বেলা একটু বাড়তে অজয় একবার ওঁর ঘরে আসে। চাটুজ্যে তখনও বিছানার ওপর বসে আছেন।

—মাস্টারমশাই কি তাহলে আজই—

চাটুজ্যে অজয়ের দিকে তাকান, একটু ভেবে বলেন—একটা কথা বলছিলাম।

—কী ?—একটু যেন ভয় পায় অজয়। তবে কি মাস্টারশায়ের যাবার মতলব নেই।

চাটুজ্যে বলেন,—বলছিলাম, কোনো হাসপাতালে যদি আমায় দিতে পারতে।

অজয় হেসে ফেলে,—হাসপাতাল ? আপনি কি খেপেছেন মাস্টারমশাই ?

চাটুজ্যে শুধু তাকিয়ে থাকেন।

—সাধন ভজন করলে বরং সগ্‌গে যাওয়া যায় কিন্তু দুটি বছর হাতে পায়ে ধরেও হাসপাতালে জায়গা মেলে না।

চাটুজ্যের দৃষ্টিটা যেন সাদা হয়ে আসে,—কেন ?

—ঘরে ঘরে রুগী, হাসপাতাল তো ও রোগের দু-তিনটে মাত্র।

—তবে ?

তবের উত্তর দিতে পারবে না অজয়। আর তবে-টবে শুনতে চায় না।

—তাহলে আপনাকে কি কোথাও পৌঁছে দিতে হবে ?

চাটুজ্যে কাঠ হয়ে বসে ছিলেন। ফ্যাকাশে মুখে তাকিয়ে ছিলেন অজয়ের দিকে।

—ইস্টিশানে যাবেন ? সঙ্গে যাব আমি ? কোথা যাবেন ?

চাটুজ্যে একটু নড়ে বসেন।

—অ্যাঁ ? যাব। হ্যাঁ যাব ! একাই যাব।

অজয় একবার বলে—একা যাওয়াটা কেমন ধারা হবে—যা ভালো বোঝেন।

অজয় গুটিগুটি বেরিয়ে যায়।

চাটুজ্যে কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন।

তারপর উঠতে হয়। উঠে বসে কম্বল আর চাদরটার ভেতর ওষুধের কৌটো দুটো, অধ্যাত্ম রামায়ণ, বালিশ, দুখানা ধুতি আর একটা জামা ভরে নেন। কী দিয়েই বা বাঁধা যায় ? একটা ধুতি বার করে তাই দিয়েই একটা গেরো দিয়ে নেন।

এটা টেনে নেওয়া যাবে কী করে ?

একটু সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন চাটুজ্যে। যেতে হবে ! বেলার দিকটায় কাশির বেগ থাকে না। সন্ধ্যের পরই কাশির বেগ বাড়ে।

বিছানাটা বগলে তোলেন। না। খুব ভারী নয়। হালকাই মনে হচ্ছে। নিতে গিয়ে যদি পড়ে যান ?

পড়ে গেলে পড়তে হবে। তবু থাকবার উপায় নেই। যেতে হবে।

বিছানাটা নিয়ে দরজাটা খুলে বেরোন।

পিছনে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হয় একবার। রাস্থকে ডাকতে ইচ্ছে হয় একবার। না থাক।

চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে আসে চাটুজ্যের। গলির মোড়ে এসে একটা রিকশায় চেপে বসেন। মুখ দিয়ে বেরোয়—শিয়ালদা চলো।

শিয়ালদায় গিয়ে তারপর? তারপর রানাঘাটের টিকিটই কাটতে হবে। তরুবালা কি তাকে ফেলে দেবে? তরুবালাও কি বলবে চলে যাবার কথা? না। কখনই নয়। তরুবালার কাছে এতকাল পরে কি এতটুকু বাসাও মিলবে না?

রিকশার ঝাঁকুনিতে মাথাটার ভেতর ঝিমঝিম করে। চোখ দুটো বুঁজে একটা হাতল ধরে কাত হন চাটুজ্যে। রানাঘাটে তাঁকে পৌঁছতেই হবে। তরুবালার কাছে যেতেই হবে তাঁকে।

এগারো

বেলায় গিয়ে রানাঘাটে পৌছেন চাটুজ্যে। অবশেষে পৌছলেন। কাশি বড় একটা হয় নি। শরীরটার ভেতর বড় ফাঁপা-ফাঁপা ঠেকছে। যেন অনেক শূন্যে ভরা দেহ। এত হালকা, উঠতে গিয়ে টলে পড়তে হয়।

তবু উঠতে হয়। স্টেশনে নামতে হয় বিছানাটা নিয়ে।

টাকা পঞ্চাশটা অজয় দিয়েছিল। পকেটেই ছিল। একবার দেখে নেন টাকাটা আছে কিনা। আছে। ঘোড়ার গাড়ি করে চলেন আজও। স্ট্র্যাণ্ড রোড।

চাটুজ্যের মাথায় সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন মনে হয় অনেকগুলো বছর আগে তিনি চলেছেন ঘোড়ার গাড়িতে তরুবালার চিঠি পেয়ে। তরুবালার জন্য ব্যাকুল হয়ে।

কই চিঠি? চিঠি তো পান নি?

কী যে সব ভাবনা আসে মাথায়! একটু নড়ে বসেন চাটুজ্যে। গাড়ির ঝাঁকানিতে যেন দেহটা উঠছে নামছে। সাড়া পাচ্ছেন না চাটুজ্যে।

খিদে পেয়েছে কি? পেতে পারে। খিদে বোধটা আজ প্রায় দেড় মাস ধরে নেই। খিদে কাকে বলে জানেন না। খেতে হয় খান। না খেলেও খিদে পায় না। আজও ঠিক খিদে হয়তো পায় নি। শরীরের গতিকে মনে হচ্ছে হয়তো বা খিদে পেয়েছে।

চুপ করে বসে থাকবার চেষ্টা করেন চাটুজ্যে।

তা ছাড়া আর উপায়ই বা কী।

গাড়ি এসে থামে বাড়িটার সামনে। চাটুজ্যে নেমে বিছানাটা হাতে করে আসেন বারান্দায়। পকেট থেকে পয়সা বার করে ভাড়া মেটাতে একটু সময় যায়। হিসেব আর মাথায় আসে না। অনেক ভেবে পয়সা গুনতে হয়। দোরের সামনে এসে ধাক্কা দেন। একটু আস্তে। ভয়ে ভয়ে।

বিছানাটা একটু সরিয়ে রাখেন। প্রথমেই বিছানা দেখলে কী ভাববে? কেন যে ভয়-ভয় করে কে জানে। তরুবালার কাছেও অস্পৃশ্য হবেন চাটুজ্যে? সাড়া নেই! আবার দোরে ঘা মারেন। কনক এসে হয়তো দোর খুলবে প্রথম দিনের মতো। চাটুজ্যের মাথায় কেবলি সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আজ।

—কে?—দোরটা খুলে যায়।

কনক নয়, তরুবালা।

চাটুজ্যে একটু হাসতে চান। কিন্তু এই কি হাসি?

তরুবালা ওর চেহারা দেখে চমকে ওঠে—তুমি?

চাটুজ্যে ঘরে ঢোকেন। বিছানাটা বারান্দায় পড়ে থাকে বাইরে। ভেতরে নেওয়া আর হয় না। নিতে পারেন না। কোথায় যেন বাধছে।

তরুবালা দোরটা ভেজিয়ে দেয়।

চাটুজ্যে কপালের কুঞ্চিত চামড়া থেকে ঘাম মোছেন। বসেন মেজেয়।

—উঠে বোসো!

—থাক।—চাটুজ্যে আবার হাসতে চেষ্টা করেন।

বলেন—তুমি আজ বেরোও নি?

তরুবালা এতক্ষণ দেখছিল চাটুজ্যের দিকে। এ কী চেহারা হয়েছে ওর? কেন আসে নি এতদিন? জিজ্ঞেস করতে কেমন যেন একটা আশঙ্কা জাগে মনে।

ও বলে—না বেরোই নি। বাতের ব্যথাটা বেড়েছে। তা ছাড়া—।

কিন্তু তোমার?

—আমার কী? আসি নি কেন?

তরুবালা ঘাড় নাড়ে।

—অসুখ হয়েছিল।

—কী?

ও কথার জবাব দেন না চাটুজ্যে। তরুবালার দিকে ঘোলাটে ছোট ছোট চোখ দুটো তুলে তাকান।

তরুবালা জিজ্ঞেস করে—তুমি শোবে?

—না থাক।—একটু একটু হাঁপাচ্ছেন চাটুজ্যে। আবার বুঝি কাশির বেগ এল।

না। সামলে নিয়েছেন।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান। জানলার ধারে যান। চূর্ণী নদীর ক্ষীণ নীরব স্রোত চোখে পড়ে। তরুবালা চৌকির ওপর বসে। বেশ মোটা হয়েছে তরু। তরুবালারও অনেক বয়েস হল। বয়েস হিসেবে মোটা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, বাত হওয়াটাও নয়।

—কী খাবে?

জিজ্ঞেস করেই আবার তরু বলে—কনকটা আবার কোথায় যে গেছে।

ওই পর্যন্তই।

চাটুজ্যে আবার মেজেতে বসে পড়েন। খিদে তাঁর যে পেয়েছে তা

নয়। খিদে আজকাল পায় না, তবু কিছু খাবার প্রয়োজন ছিল। সারা দিনটায় তো খাওয়া জোটে নি কোথাও।

দোরটা খুলে যায়। কনক ভেতরে ঢুকেছে।

—দিদিমণি, একবার ইস্কুলে যেতে হবে।

—কেন?

—তপতীদি ডেকেছে। তুমি না গেলে হবে নি।

তরুবালা নধর শরীরটাকে নিয়ে ওঠে—উঃ! একে ব্যথাটা বেড়েছে। তোরা জ্বালালি।

কনক উত্তর দেয় না। চাটুজ্যের দিকে নজর পড়ে ওর।

হঠাৎ তরুবালাকে বলে কনক—বাইরে একটা ছেঁড়া-খোঁড়া বিছানা পড়ে আছে। ওটা কার?

তরুবালা বলে—বিছানা? কার?

চাটুজ্যে কপালের খশখশে চামড়া থেকে ঘাম মোছেন আবার।

—কার বিছানা?—তবু তরু যেন আশ্চর্য হয়েই তাকায় চাটুজ্যের দিকে। কনকও তাকায়।

চাটুজ্যের কাশির বেগ এসেছে। শরীরটা কাঁপতে থাকে। গলাটা খুশখুশ করে ওঠে। তারপরই সেই অদম্য কাশি। কাশতে কাশতে চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। উবু হয়ে বসে হাঁটু দুটোর ভেতর মাথাটা গোঁজেন চাটুজ্যে।

তরুবালা ওঁর অবস্থা দেখে প্রথমটা অবাক হলেও তাড়াতাড়ি কাছে এসে ওঁকে ধরে ওর বুকে পিঠে হাত বোলাতে থাকে। চাটুজ্যের নোংরা শ্রীহীন চেহারার চেয়ে ওঁর নিদারুণ কষ্টটা চোখের সামনে দেখে ও বুকে বাজে বেশী।

জামার সামনেটা ছেঁড়া। রাসু ছিঁড়ে দিয়েছিল। ময়লা কাপড়ে

এখানে ওখানে দাগ। সর্বশরীরে শিরাগুলো কী বিশ্রী মোটা। যেন ফেটে যেতে চাইছে কাশির বেগে।

দুখানা ময়লা কাঠের মতো হাঁটুর ভেতর মাথাটা গুঁজে হাঁপাচ্ছে মানুষটা।

তরুবালার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে।

চাটুজ্যের কাশির বেগ কমে আসে ক্রমশ। হাঁপাতে থাকেন কিছুক্ষণ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে চাটুজ্যে একটু সুস্থ হতে পারেন। আবার ঘাম মুছতে হয়। তরুবালার বিস্ময়ের ভাবটা সমবেদনায় পরিণত হয়েছে তখন।

বিছানাটা কার বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। চাটুজ্যে এতক্ষণে মুখ তুলে তাকান।

তরুবালার গোল মুখখানার দিকে তাকিয়ে কী যে বলতে চান—বলতে পারেন না। অনেক কথার ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ গলা পর্যন্ত উঠে আটকে গেছে। বোবা ঢেউ ফাটে না। তরঙ্গায়িত হয় না।

—তুমি এসো দিদিমণি।—বলে কনক বেরিয়ে যায়।

চাটুজ্যে একটু সরে দেয়ালে পিঠটা রেখে বসেন।

—বিছানাটা আমার।

তরুবালা ওর আরও কাছে সরে আসে। গলার স্বরটা খুব কোমল মনে হয়—কী হয়েছে খুলে বলো তো?

চাটুজ্যের সর্বাঙ্গ ঘামছে। কী একটা উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসেন। তরুবালার দিকে সোজা তাকিয়ে বলেন—যক্ষ্মা।

নিজের অজ্ঞাতেই দু পা পিছিয়ে যায় তরুবালা।

চাটুজ্যের সর্বাঙ্গ ঘামছে। ঘামে ভিজে উঠেছে জামাটা। কপালের ভ্রু বেয়ে পড়ে টপ টপ করে। যক্ষ্মা!

তরুবালার মুখ ভয়ে আতঙ্কে শুকিয়ে ওঠে। জলতেষ্টা পায় ওর। বিছানাটা বাইরে পড়ে আছে। ভাবতেই তরুবালার হাতের তালু ঘামে। নরম মাংসল বুকের ওঠানামা গোনা যায় স্পষ্ট। যক্ষ্মা! একেবারে যক্ষ্মা!

অন্য কোন রোগ যদি হত, তবে কি তরুবালা এখনি বলত, না, বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ো? পাখা নিয়ে বাতাস করতে বসত না?

কে জানে? চাটুজ্যে জানতে চান না। থাকতে চান। এক কোণে একটুখানি জায়গায় থাকতে চান। দিনান্তে একমুঠো ভাত খেতে চান যতদিন না মৃত্যু হয়।

তরুবালা হঠাৎ হয়তো বা নিজেকে সামলে নিতে ও-ঘরে চলে যায়।

চাটুজ্যে দেয়ালে পিঠ রেখে বসে বসে ঘামছেন তখনও। আজীবন তরুবালা ওঁকে ধমকে এসেছে। কই, আজ তো একটুও ধমকাল না।

সময় কাটছে। এ ঘরে ও ঘরে। সূর্য স্থির হয়ে থাকছে না আকাশের একটা মাত্র জায়গায়। দক্ষিণ-পশ্চিমে হেলে পড়ছে সূর্য।

তরুবালা এসেছে। ঘাড় না ফেরালেও দেখতে পান চাটুজ্যে। শাড়িটা বদলেছে। হয়তো অনেক কথা ভেবেছে। কী ভেবেছে?

আন্দাজ করতে পারেন না চাটুজ্যে। ভাববার তো কিছু নেই। কীই বা ভাবতে পারে তরুবালা! একটা জবাব দিতে হবে। কী জবাব দিতে হবে, সেইটাই হয়তো ভেবেছে।

তরুবালা ঘরে ঢুকল। মুখখানা বিষণ্ণ আতঙ্কিত।

ওর পায়ে চটি কেন? ও কি বেরোবে কোথাও? ইস্কুল থেকে ডেকে পাঠিয়েছে তপতী।

তপতী কে? কে জানে?

তরু আস্তে আস্তে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দেয়ালে পিঠ রেখে বসেছিলেন চাটুজ্যে। নীরবে দেখছেন তরুবালার দিকে। একদৃষ্টে। মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে আসে চোখদুটো। ঘন ভ্রু বেয়ে ঘাম পড়ে। বাঁ হাতটা তুলে ঘাম মুছতেও কষ্ট হয় ওঁর।

তরুবালা আস্তে আস্তে কাছে আসে। চটিটা খুলে ওঁর কাছে বসে। বেদনায় গলাটা ভারী হয়ে এসেছে তরুবালার।

বলে,—কতদিন জ্বর হয়েছে?

—মাসখানেক।

—তখুনি খবর দাও নি কেন? চলে আসতে তো পারতে?

তরুর মুখের দিকে তাকান চাটুজ্যে। তরুর চোখ দুটো বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছে।

বলেন,—এতটা ভাবি নি।

তরু আস্তে আস্তেই বলে,—এমন সব ভুল কর তুমি। তখন যদি আসতে কত সহজে সেরে যেত বল তো? এখন একটু অসুবিধে হবে। তা হোক—

একটু থেমে আবার তরুবালা জিজ্ঞেস করে,—ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

ঘাড় নাড়ে চন্দ্র।

—ওষুধ খাচ্ছ কিছু?

—না।

—কেন, অজয় কী করলে তবে?

এতক্ষণে একটু ম্লান হাসতে চেষ্টা করে চন্দ্র, কী আর করবে?

চুপ করে রইল তরুবালা।

চাটুজ্যে বসে আছেন। একটা কথা বলতেও আর ইচ্ছে হচ্ছে না।

তরুবালা খুব ধীরে ধীরে বলে,—কী জান? তুমি এখানে থাকবে, তাতে আবার কীই-বা বলবার আছে। কিন্তু—

চন্দ্র তাকাবার চেষ্টা করে।

—কিন্তু এটা তো ছোট শহর। এখানকার ডাক্তার এনে তোমার চিকিচ্ছে করালে রোগটা সবাই জানবে। কনকও হয়তো থাকতে চাইবে না, কাজও করতে চাইবে না। মেয়েদের ভেতরেও কেউ কেউ ছেড়ে চলে যেতে পারে। তা ছাড়া—আমার কথা ছেড়ে দাও।

চন্দ্র চোখদুটো বুঁজে চুপ করে শোনে।

গভীর চিন্তিত হয়ে বলে তরুবালা,—অবিশ্যি এখন আমি করব না তো করবে কে! এ বিপদে তোমাকে আমি আর কোথাও যেতে দিতে পারব না। আমার সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে কী জান, তুমি আমাকে একটু যদি আগে জানাতে, আমি নিজে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসতাম। আমাকে যে কেন অসুখের কথা জানালে না!

বলতে বলতে তরুবালার গলা অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। আবার বলে—বলতে পার, আমি তো তোমার একটা খবর নিতে পারতুম! কিন্তু এদিকের কাজের এত চাপ যে তোমার কথা ভাববার সময়ও পাই নি তেমন। দোষ আমারই। সব দোষই আমার।

তরুবালা বেদনায় ম্লান হয়ে যায়। চুপ করে বসে থাকে।

চন্দ্র ঘোলাটে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে শুধু বলে—এক গেলাস জল দেবে?

তরু ওঠে। একটা কাঁচের গেলাসে জল নিয়ে আসে। এ রোগে তো যে কোন গেলাসে জল দেওয়া যাবে না।

চন্দ্র বোঝে। তবু কাঁচের গেলাসটা দেখে মনের কোথায় যেন একটু লাগে॥

তরুবালা চটিটা পরে।

—একটু বেরোব। তুমি একটু বোসো, আমি আসছি। এখুনি ফিরব। একেবারে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে চলে আসব। তুমি না হয় চৌকির ওপর শুয়ে থাকো। আসছি আমি। দেখি, ব্যবস্থা কিছু করা যায় কি না! বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তরুবালা।

নীরবে দেখলেন চাটুজ্যে। কিছুই তো আর বলবার নেই তাঁর। শুধু দেখবার আর শোনবার ছিল। কিছুক্ষণ কেটে গেল।

চন্দ্রকে চলে যেতে হবে। বেশী ভাবতে হয় নি। তরুবালার কথাই তার ভাবনা কমিয়ে দিয়েছে। সত্যিই তো, তরুবালার কী দোষ! কনক হয়তো চলে যাবে। ইস্কুল হয়তো উঠে যাবে। কেউ আর তরুর বাড়ি আসবে না। নীরেনবাবুকে নিমন্ত্রণ করেও আর আনা যাবে না। তা ছাড়া তরু সবাইকে কীই বা জবাব দেবে? যদি মানুষ বলে, কেন রেখেছেন এ লোকটাকে, কেন সব ছাড়তে হচ্ছে আপনাকে এই লোকটার জন্যে?

কী জবাব দেবে তরুবালা?

না! এ হতে পারে না। তাঁর আজীবনের কামনা তরুবালা সুখী হোক। তরুবালা শান্তি পাক। তরুকে তার জন্য আবার অকারণ এক অদ্ভুত অশান্তির ভেতরে দিন কাটাতে হবে—এটা চন্দ্র কেমন করে সহ্য করবে।

তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। এ হতে পারে না। কিছুতেই নয়।

তাঁকে যেতে হবে। তরুবালা ফেরবার আগেই তাঁকে চলে যেতে হবে।

সূর্য তো থেমে থাকছে না। পশ্চিমের প্রান্তে হেলে পড়ছে ক্রমে। চাটুজ্যের জামাটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। ঝিরঝির করে বাতাস আসছে জানালা দিয়ে।

চূর্ণী নদীর ওপার থেকে অনেক দূরের বাতাস।

মাথাটা নুয়ে আসছে ক্রমে।

তরুবালা যদি এখনি ফিরে আসে। তাঁকে যেতে না দেয়। তাঁকে নিজের কোলের ওপর টেনে নেয়।

না। তা হতে পারবে না।

আস্তে আস্তে ওঠবার চেষ্টা করেন চাটুজ্যে।

শরীরে আর একটুও বুঝি জোর নেই। বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সমস্ত স্নায়ু। আরও কী যেন করতে হবে। কোথায় যেন যেতে হবে। কোথায় ?

জোর করে চোখের পাতা খুলতে হয়। দেয়ালটা ধরে ধরে ওঠেন চাটুজ্যে। আর একটু জোর তাঁকে পেতেই হবে। তাঁকে যেতে হবে। যেতেই হবে আবার আর-এক যাত্রায়। কিন্তু কোথায় ?

ধীরে ধীরে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে আসেন চাটুজ্যে। হাতে করে বিছানাটা তুলতে গিয়ে বুকে লাগে। তবু তুলতে হবে। বিছানাটা বগলে নিয়ে এগোতে চান। বারান্দা থেকে নামতে গিয়ে বিছানাটা হাত থেকে পড়ে যায়। কাশির বেগ আসে। এবার অল্প।

বুকটা ভেঙে যায় বুঝি। আবার উপুড় হয়ে তুলে নিতে হয় বিছানাটা। সামনে তাকাতে চান চাটুজ্যে। একটু এগোলেও কি একটা রিকশা পাওয়া যাবে না ?

এগোচ্ছেন চাটুজ্যে স্টেশনের রাস্তায়। স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে চূর্ণী নদীর পাশ দিয়ে। পাশের বড় বড় মোটা গাছে পাখির কলরব।

নানা সুর আর স্বর। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। কপালে হাত রাখেন চাটুজ্যে। কী যেন হয়েছিল? কী একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন চাটুজ্যে। না, স্বপ্ন নয়। তরুবালা। তরুবালা সুখী হোক। তরুবালার শান্তি হোক। চাটুজ্যেকে কোথায় যেন যেতে হবে।

আবার রানাঘাট স্টেশন। আবার শিয়ালদা। ওখান থেকে একটা রিকশায় চাপেন চাটুজ্যে। অজয়ের ওখানে গেলে কি আজ রাতটা থাকা যাবে না? তা হয়তো যাবে। কাল চলে যাবেন অন্য কোথাও।

রিকশার ঝাঁকুনিতে মাঝে মাঝে হুঁশ থাকছে চাটুজ্যের। মাথাটা রিকশার হাতলে রেখে নুয়ে পড়েছেন। ঝিমিয়ে পড়েছেন। ঘুমিয়ে পড়ছেন। বড্ড ঘুম পেয়েছে। একটু শোবার জায়গা যদি পাওয়া যেত এখুনি!

অজয়ের বাড়ির ওই ঘরটি বড় প্রিয় চাটুজ্যের।

সামনের সেই প্রাসাদের বড় বড় থামের আশেপাশে রোদের ওঠা-নামা আর চাঁদের আলো-ছায়া বড় পরিচিত। অনেক কালের পরিচয় ওদের সঙ্গে। রিকশায় চলতে চলতে অনেকটা পথ কোন জ্ঞানই ছিল না। একবার চোখ মেলে চাইতে হল রিকশাওয়ালার ডাকে। কোন গলিতে যেতে হবে বলে দেন চাটুজ্যে।

রিকশা আবার চলে। আবার ঝিমোতে থাকেন চাটুজ্যে। রিকশা থামতে আবার চোখ খুলতে হয়। এই বাড়ি। রাখো।

বিছানাটা নিয়ে নেমে পড়েন। পয়সা দিতে হয় রিকশাওয়ালাকে।

রাত কটা হবে? গ্যাস বাতিটা বেশ উজ্জ্বল। ওই সামনের ওই বড় বড় থামগুলো। অন্ধকারে বিরাট ছায়ার মতো বড় বড় থাম। আজ কি তবে অমাবস্যা? আকাশের দিকে তাকান চাটুজ্যে। ওই তো সেই বড় বড় কয়েকটি তারা। কী নরম আর সুদীপ্ত।

সদরের কাছে এসে একবার উঁকি দেন।

—দাদু!—হঠাৎ অন্ধকার থেকে এসে পায়ের হাঁটু দুটো একেবারে জড়িয়ে ধরে রাস্থ। চাটুজ্যে প্রথমটা চমকে ওঠেন। ঘোর-ঘোর ভাবটা কেটে যায়। রাস্থর মাথার চুলগুলোর ওপর বাঁ হাতটা রাখেন। কী নরম চুল রাস্থর।

—কখন এলে দাদু?

হঠাৎ চাটুজ্যের মনে পড়ে দুটো অক্ষর। যক্ষ্মা।

—ছাড়ো আমায়। ছাড়ো।

রাস্থ ওঁর হাতটা ধরে এবার।

—চলো ঘরে যাই।—বলেন চাটুজ্যে।

রাস্থ আস্তে আস্তে বলে—ঘরে তালা।

—তালা? কেন?—বলতে বলতে চাটুজ্যের নিজেরই মনে হয়, কেনই বা দেবে না। সে তো আজ সকালে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ঘরে তালা পড়াই তো স্বাভাবিক। ও ঘর তো তাঁর নয়। কী আশ্চর্য, এতকাল ধরে ওই ছোট ঘরখানায় থেকে তাঁর মনে কখন যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ঘরখানা তাঁরই। নিজের মন নিজেকে কেমন আশ্চর্যভাবে ঠকায় সময় সময়।

রাস্থ বলে—চাবি মার কাছে।

চাটুজ্যে কথা বলেন না। দোরের সিঁড়ির পাশে বিছানাটা রেখেছিলেন, তার পাশে বসে পড়েন। আজ রাতটা তবে কোথায় থাকবেন? এখানে এই গলিটায়? তাতেও হয়তো বা আপত্তি উঠতে পারে। গলিটাও তো কাল ধোবার প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

স্নায়ুগুলো সব অবশ হয়ে আসছিল। রাস্থ কখন যে এর মধ্যে ভেতরে চলে গেছে উনি টেরও পান নি। রাতটা আজ খুব অন্ধকার হবে। আজ কি অমাবস্যা?

রাস্থ ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।—এই যে দাদু—

চোখ দুটো মেলতে হয় আবার।

—চাবি এনেছি লুকিয়ে। দোর খুলে ভেতরে চলো।

চাটুজ্যে চাবিটা হাতে নেন। রাস্থর দিকে একবার ভালো করে তাকান। রাস্থর সুগোল মুখে দুটো বড় বড় চোখ। একমাত্র এই একজোড়া চোখে কোনো আতঙ্ক নেই, কোনো ভয় নেই। নরম নিটোল ভালোবাসায় ভরা। সংসারে এমন দুটি চোখ তাহলে আছে যেখানে একটু আশ্রয় মেলে।

চাবিটা রাস্থর হাতে ফিরিয়ে দেন চাটুজ্যে।

—কী হল?

—চাবি রেখে এসো।

—কেন, মা তো জানে না।

—তা হোক।

—বা রে, তবে তুমি কোথায় থাকবে?

চাটুজ্যে চোখ নামান। আবার অবসাদ। নিদারুণ অবসাদ এসে আচ্ছন্ন করছে চাটুজ্যেকে। ঘাড় সোজা করে রাখতে পারছেন না। একটু যেন শীত-শীত করছে। বিছানাটার পাশে গুটিসুটি হয়ে বসেন চাটুজ্যে। বসতেও কষ্ট হচ্ছে। আজ একটু শুতে চাইছেন। একটু শোবার জায়গা। কতকাল শুতে পান নি, বিছানায় পিঠ দিলেই আসত কাশির বেগ। আজ আর কাশির বেগকেও ভয় নেই। একটু ঘুমোতে চাইছেন আজ।

—দাদু!

আঃ! ছেলেটা জ্বালালে।

—অ দাদু!

চাটুজ্যে নীরবে মাথাটা একটু ওঠাতে চাইছেন।

—দাদু, তুমি কোথায় থাকবে?

চাটুজ্যে কী বলবে? কী জবাব দেবে? রাম্বুর কথার জবাব কই?

—কোথায় যাবে?—রাম্বুর গলাটা ভারি মনে হয় যেন।—জান দাদু, আজ দুপুরে—

চাটুজ্যেকে তাকাতেই হয় ওর দিকে।

—আমি—

—কী?—চাটুজ্যে ওর দিকে তাকান।

রাম্বুর গলাটা বড্ড ভারি—আমি কেঁদেছিলুম।

বলে মুখটা লুকোতে গিয়ে চাটুজ্যের পিঠে গালটা রাখে রাম্বু।

আঃ! রাম্বুর গালের কী নরম উত্তাপ! চাটুজ্যের স্নায়ুতে স্নায়ুতে সে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে যেন। রাম্বুর চোখের জল ফুলো-ফুলো গাল বেয়ে যদি পড়েই থাকে, তবে সেটুকু কি এই সুদীর্ঘ হতভাগা জীবনের যথেষ্ট পাওনা নয়।

—রাম্বু!

রাম্বুর মায়ের গলা। চিনতে একটুও দেরি হয় না। এদিকে আসছে বুঝি। চাটুজ্যে মুহূর্তে রাম্বুর কাছ থেকে তফাতে সরে যান।

—কী রে?—বলতে বলতে রাম্বুর মা এসে পড়ে।—ওমা, যা ভেবেছি তাই। ইদিকে আয় হতচ্ছাড়া।

রাম্বু ওখান থেকে নড়ে না। মুখটা চাটুজ্যের দিকে ফিরিয়ে বলে, —চলো দাদু, ঘরে চলো। ওই তো মা এসেছে।

—ঘরে? ওমা, চাবি আনা হয়েছে এর মধ্যে। হতচ্ছাড়া অনামুখো আয় বলছি।

রাম্বু মায়ের গালাগালকে যেন গ্রাহ্যই করছে না। তেমনিই বসে রয়েছে।

—এলি ভেতরে! মরবি না কি! আর মানুষটারও আক্কেলের বলিহারি। কচি ছেলেটাকে না মেরে ছাড়বে না।

চাটুজ্যের কানে কি কথাগুলো যাচ্ছে? ঠিক বোঝা যায় না। চাটুজ্যে বোধহয় ঘুমোচ্ছেন।

—এলি উল্লুক!

বলতে বলতে রাসুর মা অগত্যা এগিয়ে এসে চাটুজ্যের ছোঁয়া বাঁচিয়ে রাসুকে টেনে আনেন এধারে।

—রাত্তিরে চান করিয়ে ছাড়ব তোকে। আসুক সে, সব বলব।

রাসু চেঁচাচ্ছে—ছাড়ো বলছি, ছাড়ো। দাদুর কাছে যাব আমি।

—যাওয়াচ্ছি। একটা কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান নেই গা! টি. বি. হয়ে মর না, অত যদি মরবার শখ হয়েছে।

রাসুর চিৎকারটা কানে লাগে। চাটুজ্যে নড়ে বসেন একটু।

আঃ! ছেলেটা কেন যে এত চেঁচাচ্ছে!

ধীরে ধীরে চীৎকার মিলিয়ে যায়। রাসুর মায়ের গলাও আর পাওয়া যায় না। রাসুকে স্নান করতে হবে। স্নান করে বোধহয় ওপরে চলে গেছে। অজয় কি এখনও ফেরে নি? ফেরে নি বোধহয়।

কিন্তু এখানে বসে আছেন কেন চাটুজ্যে? মাথাটায় সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেন তাঁকে যেতে হবে? কোথায় যেন গিয়েছিলেন তিনি?

কী যে সব হয়ে গেল। ঘটনার পর ঘটনা—যেন অনেক স্বপ্ন একের পর এক দেখছেন। গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব।

কোথায় ছিলেন তিনি এতকাল? কোথায় যাবেন এর পর?

রানাঘাটে তরুবালার কাছে কতকাল আগে গিয়েছিলেন? তরুবালা

হাসছে বোধহয় সে কথা ভেবে। আজ গিয়েছিলেন কি রানাঘাটে? আজ?

ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে আকাশের দিকে তাকান চাটুজ্যে।

তরুবালা ভালো আছে। ভালো থাক।

আকাশের ওই যে বড় বড় নক্ষত্র ক-টি—কত নরম আর কী সুদীপ্ত। তরুবালার চোখদুটো তো এখন দেখতে পেলেন না চাটুজ্যে? তরুবালা কি মরে গেছে? কবে মরল? সব গুলিয়ে গেল। চাটুজ্যের শীত-শীত লাগছিল। মাথাটায় রাজ্যের শূন্য—অগাধ শূন্য। ভাবনাগুলো ঠিক ঠিক আসছে না আর মাথায়।

চাটুজ্যে কী যেন ভেবে উঠে পড়েন। এতক্ষণ কি স্বপ্ন দেখছিলেন? কেমন বিভোর হয়েছিলেন অনেকটা সময়। চোখের ওপর ভাসছিল বিরাট পর্বতশ্রেণী। তুষারশুভ্র সুবিশাল। তার নীচে দূরদূরান্ত নির্জন প্রাণহীন। ওখানে কোন বিষাক্ত প্রাণীর বাসা নেই। বিষ ছড়ায় না। ধূ ধূ প্রান্তরে তুষারে ঢাকা কঠিন পাথর। পাথর এখনও বিষিয়ে যায় নি এখানকার মাটির মতো। ওখানেই ওঁকে যেতে হবে।

উঠে পড়েছেন চাটুজ্যে। কিন্তু কোথায় সেটা?

একটু থমকে দাঁড়ান। কী যেন ঠিক ভাবতে পারছেন না। রাসুর গালের উত্তাপ, রাসুর চোখের জল। ঠিক মনে এসেছে। হরিদ্বার। হরিদ্বার যেতে হবে। সেখান থেকে হিমালয়ের পায়ের নীচে নির্জন কোন জায়গায় একটু শোয়া যাবে। ওখানে এখনও বিষ ছড়ায় নি।

চাটুজ্যে বিছানাটা আবার তুলতে যান। টলে পড়ে যান পাশেই। কাশির অদম্য বেগে থরথর করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। পাঁজরাগুলো কি গুঁড়ো হয়ে যাবে? রাস্তার ওপর বসে পড়তে হয়। আবার ঘাম।

কপালের হাড়ের ওপর বিশুষ্ক চামড়া ঘামে ভিজে উঠেছে। ঊর্ধ্বক মুছতে আর হাত ওঠে না। ঘাম বেয়ে পড়েছে গালের কোটরে। শুধুই কি ঘাম?

চাটুজ্জের ঘোলাটে চোখদুটোও কি ঘেমেছে? ওখানে জল কেন? আকাশের দিকে তাকান। ওই তো সুদীপ্ত তারাগুলি। জ্বলজ্বল করছে আপন মহিমায়।

-চাটুজ্যে উঠতে চান। তাঁকে যে যেতেই হবে। চোখদুটোয় জ্বালা। কেন জ্বালা? জ্বালা কি ধুয়ে যায় নি জলে? চাটুজ্যে উঠতে গিয়ে আর-একবার বসে পড়েন। আর কি উঠতে পারবেন না? কখনও না?

চোখের কোটর থেকে জলের ধারা নেমেছে। সর্বশরীর কাঁপছে। দু-একটা রাস্তার লোক দাঁড়িয়ে পড়ে। কী হল? কৌতূহল।

কিছু হয় নি। এখুনি উঠবেন চাটুজ্যে। উঠতেই হবে তাঁকে। যেতে হবে। এই তো উঠেছেন। কাঁপতে কাঁপতে উঠেছেন। বিছানাটা নিয়ে এগোচ্ছেন এক পা দুপা। রাসু কি এখন ঘুমিয়ে পড়ল? ঘুমোক।

তরুবালাও কি ঘুমিয়েছে এতক্ষণে? ঘুমোক। তরুবালা ঘুমোক।

কয়েক পা এগিয়ে একটা শব্দে চমকে তাকান চাটুজ্যে আকাশের দিকে। দুটো রঙীন আলো জ্বলছে আর নিভছে। গর্জন করতে করতে এগোচ্ছে যান্ত্রিক বিমান।

তারা কটি কোথায়? ওরা কি ঢাকা পড়ল এই যন্ত্রের পেছনে?

মাথাটা আবার গুলিয়ে যাচ্ছে চাটুজ্যের। কোনটা সত্যি? যান্ত্রিক বিমানের আলো, না ওই নরম উজ্জ্বল তারার আলো? কোনটা সত্যি?